সুরক্ষক

বার্ষিক প্রকাশনা
২০১৭

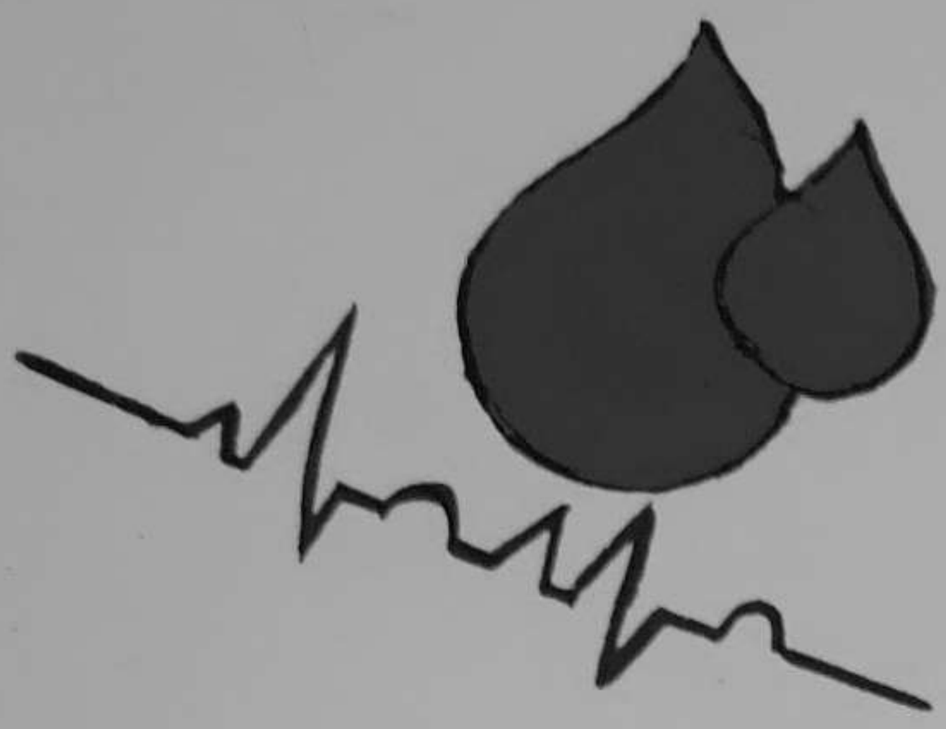

সন্ধানী
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট

উদ্দেশ্য

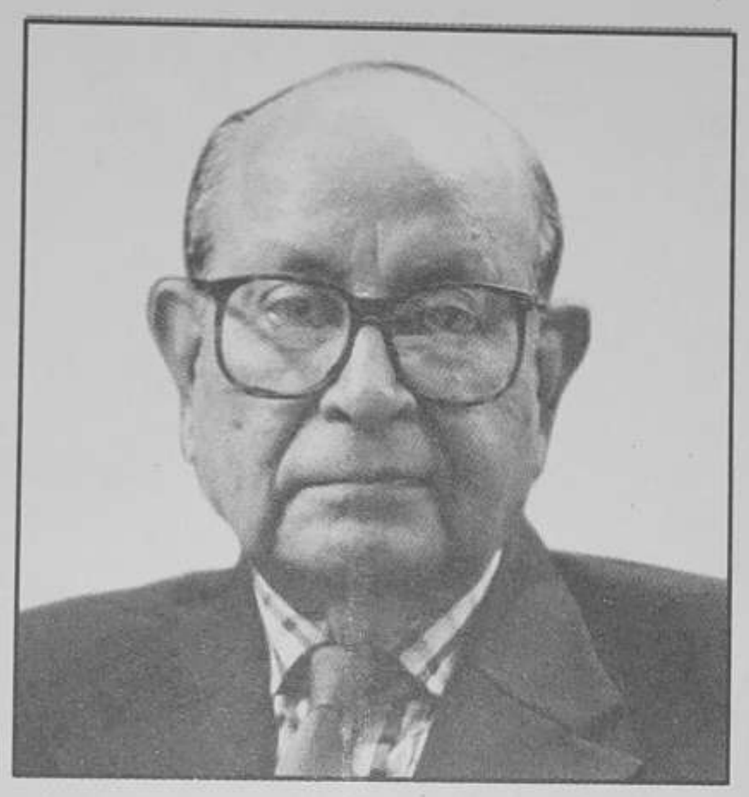

মোহাম্মদ রাফি খান
০১ আগস্ট ১৯২৮ – ০৫ নভেম্বর ২০১৬

মোহাম্মদ রাফি খান, সংক্ষেপে এম আর খান (১ আগস্ট ১৯২৮ – ৫ নভেম্বর ২০১৬), বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের পথিকৃৎ। ১৯৫২ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে তিনি এমবিবিএস পাশ করেন। এরপর এডিনবার্গ (১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৭৮), লন্ডন (১৯৫৭) ও ঢাকা (১৯৭৪) হতে তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন।

১৯৬৩ সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৮ সালে প্রফেসর হিসেবে অবসর নেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের পেডিয়াট্রিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা (১৯৬৪-৬৫ সালে) এবং ঢাকা শিশু হাসপাতালকে শক্তিশালী করতে কাজ করেন (১৯৭৮-৭৯ সালে)। তিনি বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন। এছাড়া ২০০৯ সালে একুশে পদক ও ২০১৬ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন।

তার মৃত্যু বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

সুধক

বার্ষিক প্রকাশনা-২০১৭

সন্ধানী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট

সম্পাদনা পরিষদ : অশোক কুমার মন্ডল
মাহির শাহরিয়ার নবীন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : ডা. আফরোজা তামান্না শিমু
ডা. শিমুল কান্তি দে
সুফিয়ান সিদ্দিকী
জারিন শরীফ সুপ্তি
মেহেদী হাসান তুষার

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : ডা. তরুণ তপন বড়ুয়া
ডা. রেজাউল হক টিপু
ডা. শুভ্র প্রকাশ দত্ত
ডা. নাজিম উদ্দিন
ডা. মশিউর রহমান সাগর
ডা. মুহাম্মদ ইরফানুল আলম
ডা. মাসুদুর রহমান
ডা. সুরাইয়া আক্তার জেমী
ডা. পূর্ণা তালুকদার
ডা. ওমর ফারুক
ডা. মাঈদুল ইসলাম সোহেল
ডা. বিবেক দেব
ডা. এ্যানি দে
ডা. নুযহাত ফাতেমী তুষ্টি
ডা. মোশাররাত জাহান রুখসাত
ডা. নাজিয়া সুলতানা জিহান
ডা. এন. এম. ইমতিয়াজ চৌধুরী আসিফ
মো. সামসুজ্জামান সোহেল
ডা. স্বরবীথি বড়ুয়া
ডা. পুনম পালিত
ডা. সাখাওয়াত হোসেন সজীব
ডা. অপূর্ব বিশ্বাস
ডা. সেঁজুতি দাশ পূর্ণা
ডা. পরীক্ষিত দত্ত
ডা. বিনয় সেন
মো. আল আমিন
ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস সোনিয়া
ইমরুল হাসান
রায়হান মোল্লা
ডা. আফরোজা আহমেদ মমি
সৌমিক মল্লিক
দীপ্ত বিশ্বাস
এবং
সন্ধানীর সকল সদস্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ : তাসিন আফরোজ

মুদ্রণে : দি এ্যাড কমিউনিকেশন
৬৫, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-৬১১৭১১

DONATE BLOOD SAVE A LIFE

লেখাক্রম

৭ সম্পাদকীয়

৮ বাণী

১০ সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের গঠনপ্রণালী

১১ সন্ধানী সংগীত

১২ সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ইতিহাস

১৩ যে অনুভূতি আর অনুভবে শুরু হয়েছিল সন্ধানীর পথচলা

১৪ রক্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর

১৫ মরণোত্তর চক্ষুদান সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন-উত্তর

১৬ যাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট আজ এখানে

১৭ আজীবন সদস্য

২০ কার্যকরী পরিষদ ২০১৬-১৭

২২ সন্ধানীর অর্জিত পদক

২৩ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

লেখাক্রম

৩১ বিপর্যস্ত মানবতা, কিছু মানবিকতা
ডা. তরুন তপন বড়ুয়া

৩২ নাকের রোগ
ডা. জহুরা খানম

৩৩ অটিজম
ডা. বাসনা মুহুরী

৩৫ অনলাইন কোর্সের সাতকাহন
ডা. ওমর ফারুক

৩৬ কেউটে
ডা. আসির মোসাদ্দেক সাকিব

৩৯ টোকাই
ডা. ফায়েমা ফার্মি

৪০ সময় যখন থমকে দাঁড়ায়
সৈকত বড়ুয়া

৪১ মানস রোগের ইতিকথা
ত্রিদেব দেবনাথ অপু

৪২ বাজান ও বাজান
প্রিমা জাহান

৪২ মেধা বনাম পরিশ্রম ও ধৈর্য
মুহাম্মদ ওমর ফয়সাল

৪৩ প্রায়শ্চিত্ত
সোহেল রানা

৪৫ আত্মার ওপারে
তাসমিন আক্তার শোভা

৪৬ HEMOCHROMATOSIS : Let Me Bleed!
Nazmus Sakib Sarker

৪৭ প্রত্যাশা
মারিয়া ফাতিমা

৪৮ ব্লাড ডোনেশন
সামি মো. নিজাম

৫০ ভীষণ ডিপ্রেসডদের জন্য তিনটি গল্প
মালিহা মেহজাবীন

৫১ সমর্পণ
সারা জয়ীমা শওকত

কবিতা ও ছড়া

৫৩ কবিতা ও গান
প্রফেসর ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী

৫৪ ৫৫তম প্রজন্ম! তোমাকেই বলছি
ইসরাত সুলতানা

৫৫ অকাল বোধনে প্রেম
প্রিতম মল্লিক টুটুল

৫৫ ইচ্ছেঘুড়ি
হাসান মুহাম্মদ শহীদুজ্জামান

৫৬ Truth is beauty To My Beloved Sandhani
Israt Sultana

৫৬ অষ্টাদশী
সামি মোহাম্মদ নিজাম

৫৭ মৃত শহর
নাহিদ হাসান

৫৭ প্রশ্ন
ইসরাত সুলতানা

সম্পাদকীয়

সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিটের জন্ম ১৯৮২ সালে। সন্ধানী চমেক ইউনিটের জন্মলগ্ন থেকে আমরা সন্ধানীয়ানরা অরাজনৈতিক, অলাভজনক এবং মানবতাবাদী এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ পালনে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

৩৫ বছরের সফল পথচলায় আজ সন্ধানী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট দুঃস্থ ও আর্তের আস্থার প্রতীক।

অশোক কুমার মন্ডল
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
সন্ধানী চমেক ইউনিট

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

বাণী

দুঃস্থ আর অসহায়ের নির্ভরতার প্রতীক সন্ধানী একটি কালজয়ী নাম। একটি ইতিহাস, একটি নীরব সামাজিক বিপ্লব। সন্ধানী শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রত্যয়, একটি মানবিক আন্দোলন, সন্ধানী একটি বিশ্বাসের নাম, রক্তের অভাবে মুমূর্ষু মানুষের চোখের চাহনির নাম সন্ধানী, অন্ধের চোখ উদ্ভাসিত আলোর নাম সন্ধানী।

সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিটের ২০১৬-১৭ সেশনে শেষে প্রকাশিত বার্ষিক প্রকাশনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ডা. সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

বাণী

এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে, সন্ধানী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট আরেকটা সফল সেশন ২০১৬-১৭ শেষে তাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

৩৫ বছর ধরে সন্ধানী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের মত মহৎ কাজের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত সমাজের জন্য নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, মানবতাকে ভালবেসে শুধুমাত্র সেবাকেই হৃদি সদিচ্ছাকে সম্বল করে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা 'সন্ধানী' নামটিকে দিয়েছে অপার্থিব মাত্রা।

সন্ধানীয়ানদের এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ রক্তের অভাবে যেন একটি জীবনও ঝরে না পড়ে। সন্ধানীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(ব্রিগে. জেনা. মো. জালাল উদ্দীন)
পরিচালক
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ সভাপতির বাণী

'সন্ধানী' শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রত্যয়, একটি মানবিক আন্দোলন। হাসপাতালের অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে রক্তদান, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ, শীতবস্ত্র বিতরণ ও অন্যান্য সেবামূলক কর্মকাণ্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আর্তমানবতার সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে সন্ধানী দেশের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

সন্ধানীর প্রতি জড়িত সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

জাহারুল হোসেন খান
সভাপতি, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ
সেশন : ২০১৬-১৭

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ সাধারণ সম্পাদকের বাণী

"মৃত্যু জীবনকে ছিনিয়ে নিতে পারে
কিন্তু চোখ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারে
অন্যের চোখের জ্যোতি হয়ে।"

এই মূলমন্ত্র নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে সন্ধানী। যা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে, যা জয় করে নিয়েছে অগণিত মানুষের হৃদয় স্বীয় কর্মকাণ্ডের দ্বারা।

সাড়ে তিন দশক ধরে সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল ইউনিট মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সন্ধানী মানুষে মানুষে বেঁধেছে রক্তের বন্ধনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধানী সবসময় বিশ্বাস এবং আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে থাকবে সাধারণ মানুষের কাছে এই কামনা করি। সন্ধানী দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাক।

মোঃ শিবলী শাহরিয়ার
সাধারণ সম্পাদক
সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ, সেশন : ২০১৬-১৭

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ সভাপতির বাণী

'সন্ধানী' শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রত্যয়, একটি মানবিক আন্দোলন। হাসপাতালের অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে রক্তদান, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ, শীতবস্ত্র বিতরণ ও অন্যান্য সেবামূলক কর্মকাণ্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আর্তমানবতার সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে সন্ধানী দেশের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

সন্ধানীর প্রতি জড়িত সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

জাহারুল হোসেন খান
সভাপতি, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ
সেশন : ২০১৬-১৭

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ সাধারণ সম্পাদকের বাণী

"মৃত্যু জীবনকে ছিনিয়ে নিতে পারে
কিন্তু চোখ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারে
অন্যের চোখের জ্যোতি হয়ে।"

এই মূলমন্ত্র নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে সন্ধানী। যা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে, যা জয় করে নিয়েছে অগণিত মানুষের হৃদয় স্বীয় কর্মকাণ্ডের দ্বারা।

সাড়ে তিন দশক ধরে সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল ইউনিট মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সন্ধানী মানুষে মানুষে বেঁধেছে রক্তের বন্ধনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধানী সবসময় বিশ্বাস এবং আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে থাকবে সাধারণ মানুষের কাছে এই কামনা করি। সন্ধানী দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাক।

মোঃ শিবলী শাহরিয়ার
সাধারণ সম্পাদক
সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ, সেশন : ২০১৬-১৭

বাণী

ত্যাগ ও সেবার মহিমায় উজ্জ্বল সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট বিগত ৩৯ বছরের প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানকে একটি সফল আন্দোলনে রূপ দিয়েছে।

মানবতার সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেবার পাশাপাশি সন্ধানীয়ানরা বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজেও সমান পারদর্শী। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সন্ধানীর বার্ষিক ম্যাগাজিন। যে মহান আদর্শে ব্রতী হয়ে একদিন সন্ধানীর জন্ম হয়েছিল যুগ যুগ ধরে যেন তা পরম শ্রদ্ধায় লালিত হয় প্রতিটি সন্ধানীয়ানের অন্তরে। ভালো থাকুক 'সন্ধানী'। ভালো থাকুক 'সন্ধানী'র সাথে সম্পৃক্ত সব মানুষ। শুভকামনায়–

ডা. আফরোজা তামান্না শিমু
কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, সন্ধানী চমেক ইউনিট
সেশন : ২০১৬-১৭

সময়ের পথ পরিক্রমায় শত বাধা পেরিয়ে, এক ফোটা রক্তে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে দেয়ার সন্ধানে ছুটে চলেছে যে সংগঠন, তার নাম সন্ধানী। সেবাই আমাদের আদর্শ, যে আদর্শকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলছি। চলার পথে বিস্তর বাধা আমরা পেরিয়ে চলেছি সৃষ্টির আনন্দে– যে সৃষ্টির মধ্যে নেই কোনো কৃত্রিমতা।

মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাণের এই সংগঠন জগৎ মুখে ফুটিয়ে তোলে কৃতজ্ঞতার হাসি। নিঃস্বার্থে কাজ করে যাওয়া সন্ধানীয়ানদের তথ্যের ভিত্তিতে মানুষ জেনেছে রক্তদানের গুরুত্ব ও উপকারিতা। মানবসেবার এ সংগঠন সেবার ধর্ম প্রজ্বলিত রেখে সমাজের কোণায় কোণায় মানব ছটার দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়ে যাক।

ডা. শিমুল কান্তি দে
সভাপতি, সন্ধানী চমেক ইউনিট
সেশন : ২০১৬-১৭

দৃষ্টিহীনের দৃষ্টির মাঝে
মুমূর্ষের শোণিত প্রবাহে
মোরা লিখি মানুষের নাম
সন্ধানী

সন্ধানী একটি আবেগ, একটি পরিবার, একটি আস্থার নাম। ছোট একটি পরিবার থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে তা আজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে। যার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনি একটি শাখা হলো 'সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট' যার ছায়াতলে কাজ করে যাচ্ছে অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী, উপকৃত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের পথিকৃৎ এই প্রতিষ্ঠানটি যুগ যুগ ধরে নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সেবা দিয়ে যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করি। এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন রক্তের জন্য কোনো হাহাকার থাকাবে না, থাকবে না কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বের অভিশাপ।

পরিশেষে সন্ধানী পরিবারের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অসংখ্য ধন্যবাদ, যাদের বদৌলতে সন্ধানী আজ আস্থা ও ভালবাসার প্রতীক।

সুফিয়ান সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, সন্ধানী, চমেক ইউনিট
সেশন : ২০১৬-১৭

গল্প
প্রবন্ধ
ও
কবিতা

বিপর্যস্ত মানবতা, কিছু মানবিকতা

ডা. তরুন তপন বড়ুয়া
উপদেষ্টা, সন্ধানী, চমেক

ক'দিন ধরে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করেও লেখাটি শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে উঠছে না। মন বসাতে পারছি না। ভাবছি, লিখে কী হবে? লিখে আসলে কিছু হচ্ছে না। ইদানীং মনে হয়, সভ্যতার চাকাটি বুঝি পিছনের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। আমরা ক্রমশ আবার আদিম যুগে ফিরে যাবার আয়োজন করছি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজির ক্রমবিকাশ প্রভৃতি ধাপ পেরিয়ে সাম্রাজ্যবাদের করাল থাবায় বিপর্যস্ত পৃথিবী। সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার। জঙ্গিবাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ফণা তুলছে।

এরকম একটি প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে। মানবিক পৃথিবীর স্বপ্ন তাদের চোখে-মুখে। ভালো লাগে, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কাঠফাটা রোদ্দুরে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হয়, তখন একটু শীতল হাওয়া যেন শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িক ফিসফিসানি কিংবা অস্ত্রের ঝনঝনানির বাইরে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কিছু মানুষের এই ব্যাকুলতা আশা যোগায় বৈকি।

কতভাবেই তো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। শুধু চাই অন্তর-এর আহ্বান মানুষের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা এই মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে রাখার নানা আয়োজন চলছে সবখানে। নিজেকে নিয়ে মানুষ যত ডুবে থাকবে, তত খুশি যেন পুঁজিপতিরা। তাই ভোগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা সবসময়। ভোগ করো, পণ্য কেনো– এই তাদের মন্ত্র, পণ্য-দাসত্বের শেকলে সবাই বন্দি, যেন এই শেকল ভেঙ্গে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে শুধু অর্থই কি সব? অর্থ দিয়ে কি সব পাওয়া যায়? সময় রক্তের অভাব হাসপাতালে যে অসহায় রোগীটি শুয়ে আছে, তার প্রয়োজন রক্ত, অর্থ নয়; কিংবা কর্নিয়ার অস্বচ্ছতাজনিত কারণে অন্ধ যে ব্যক্তিটি বছরের পর বছর ধরে তার প্রতীক্ষা মরণোত্তর চক্ষুদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ সদ্যমৃত কোনো ব্যক্তির চোখের কর্ণিয়ার জন্য। এ দু'টো দানেই অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু স্বেচ্ছায় রক্ত-দানের সদিচ্ছা কিংবা মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকারও তার বাস্তবায়নে পরিবারের সদস্যদের অর্থব্যয় ছাড়াই এ দু'টো মহৎ কাজ যে কেউ করতে পারে।

অর্থ ছাড়া আর কি দান করা যারা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গতিপথ সীমিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার মাঝে অত্যন্ত নগণ্য আমাদের জীবনকাল। একে স্রেফ আত্মকেন্দ্রীকতায় না ভাসিয়ে কিছু সময় আমরা মানবিক কাজে ব্যয় করতে পারি। স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে যদি মনের আনন্দের খোরাক পাওয়া যায় মানবিক কাজ ও বিনোদন লাভ- দু'টো একসাথেই হয়ে যায়। হরেক রকম মানুষের সাথে মতবিনিময় ভালো কাজে উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যে যারা মনের শান্তি খুঁজে পায়, তারাই তো মানুষ যে পেশায় আমরা থাকি না কেন, তার মধ্যেই মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করতে পারলে কতটা শান্তিময় হয়ে উঠতে পারত পৃথিবী।

একজন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, পুলিশ কিংবা সাংবাদিক– তার চাহিদা যদি আকাশচুম্বী না হয়, তবে সৎভাবেই সাদাসিধে জীবনযাপন করতে পারে। একজন সুচিকিৎসক কখনও অর্থকষ্টে থাকার কথা নয়, যদি কেবল ধৈর্য্য ধরে সৎভাবে এবং সুচারুভাবে তার রোগীদের সেবা দিয়ে যায়। একইভাবে একজন প্রকৌশলী, আমলা, পুলিশ কিংবা সাংবাদিক কমিশন বা ঘুষ না খেয়েও স্বচ্ছল থাকতে পারেন যদি ধনীদের তালিকায় দ্রুত নাম উঠানোর আকাঙ্ক্ষা কাজ না করে। একজন মানুষ যে পেশারই হউক না কেন, বিশাল ধনী হয়েও তার প্রাপ্তি কি? নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই তো আমরা সবাই ছুটে চলেছি। তাহলে জীবনের যেটুকু সময় বাকি, দুর্নীতির পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত না হয়ে তাকে পরের কল্যাণে কাজে লাগিয়ে মৃত্যুর পর আত্মার সদ্‌গতির ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা মানুষকে সৎ জীবনযাপন করতে বলেনি কিংবা অসহায় মানুষের পাশে থাকতে উপদেশ দেয়নি। সব জেনেও আমরা না জানার ভান করে আছি। আমরা যতদিন সুস্থ-সবল থাকি কেবলই অর্থ-বিত্তের পেছনে ছুটি। তারপর যখন অসুস্থ কিংবা মুমূর্ষু হয়ে শয্যাশায়ী হই, ফেলে আসা জীবনের জন্য আফসোস করি, আর নিজের অসহায়ত্ব কিংবা একাকীত্ব উপলব্ধি করি। এই বোধ জীবনের প্রথমেই যদি প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জাগানো যায় তবেই জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। সন্ধানীর কর্মীরা সেই কাজটিই করে চলেছে।

সন্ধানীর জয় হোক, জয় হোক মানবতার।

অটিজম

ডা. বাসনা মুহুরী
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু-নেফ্রোলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম
আজীবন সদস্য, সন্ধানী, চমেক ইউনিট

অটিজম কোনো রোগ নয়, মস্তিষ্কের স্নায়ুবিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা মাত্র, যার ফলে শিশু অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, কথার মাধ্যমে বা ইশারায় ভাব প্রকাশে অসুবিধা হয় এবং একই কাজ বা আচরণ বারবার করে। যদিও অটিজমের সূচনা মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিকাশকালীন সময়ে, বেশীরভাগ লক্ষণসমূহ সাধারণত ১২ মাস থেকে ১৮ মাস বয়সে শিশুদের মাঝে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কোনো কোনো শিশু দেড়-দু'বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে, এরপর স্বাভাবিক বিকাশগত দক্ষতাগুলো হারিয়ে ফেলে এবং অটিজমের লক্ষণসমূহ তাদের মধ্যে প্রতিভাত হয়।

অটিজমের কারণ হিসাবে জিনগত (জীবকোষ) পরিবর্তন, বংশগত প্রভাব পরিবেশের প্রভাব, গর্ভকালীন মায়ের কোনো অসুবিধা, জন্মকালীন জটিলতা, কম ওজন ইত্যাদির সম্পৃক্ততা আছে বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন। অটিজম-এর চিকিৎসার জন্যে এখন পর্যন্ত কোনো ঔষধ পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে অটিজম শনাক্ত করে দ্রুত আচরণগত এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নিলে এই শিশুরাও অন্যান্য শিশুদের মত উন্নতি করতে পারে; এর জন্য প্রয়োজন পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা।

কোনো শিশু যদি-

❖ ৬ মাস বয়সের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে না হাসে

❖ ৯ মাসের ভিতর তার পরিচতজনদের সাথে কোনো প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ না করে

❖ ১ বছরের ভিতরে মুখে কোনো শব্দ না করে, আঙুল দিয়ে কোন কিছু না দেখায়, কোনো অঙ্গভঙ্গি না করে

❖ ১৬ মাসের ভিতর একটি শব্দও না বলে

❖ ২ বছরের ভিতর দুইটি শব্দের বাক্য না বলে

❖ অর্জিত সামাজিক বা যোগাযোগ দক্ষতা যদি হঠাৎ করে হারিয়ে ফেলে-

অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র/ স্বাস্থ্যকর্মী বা শিশু চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

অটিজমের লক্ষণসমূহ সব আক্রান্তদের মধ্যে একইরকম নয়, অন্যতম লক্ষণসমূহ হলো– এরা একা থাকতে পছন্দ করে, নাম ধরে ডাকলে সারা দেয় না-যদিও কানে শুনে; চোখে চোখ রেখে তাকায় না; কোনো বিশেষ জিনিষের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি; বিভিন্ন জিনিস ঘুরাতে পছন্দ করে; বড়দের হাত ধরে টেনে নিয়ে

প্রয়োজন বোঝায়; অতিমাত্রায় অস্থির, চঞ্চল অথবা নিষ্ক্রিয়; যা শুনে হুবহু সেটাই বলে; ভয় ও বিপদ বুঝে না; অস্বাভাবিক আচরণ করে, শরীর দোলায়, হাত নাড়ায়, লাফায়, অর্থহীন শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমা করে, ব্যথা পেলে অনুভব করতে পারে না; অনেকেই উচ্চশব্দ, অতিরিক্ত আলো ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না, সব স্বাভাবিক খাদ্য এরা খেতে পারে না; সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিতে শিখতে পারে না, একই নিয়মে চলতে পছন্দ করে, কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না।

অটিজমের লক্ষণসমূহ মৃদু থেকে মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে, তাই অটিজমকে বলা হয়- "অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার"।

অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর জরিপ মতে প্রতি ৬৮ জন আমেরিকান শিশুর মধ্যে একজন অটিজম আক্রান্ত, এবং প্রতি ৪ জনে ৩ জনই ছেলে। যদিও আমাদের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই, অতি সম্প্রতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত প্রতিবন্ধীতা জরিপে (ডিডিএস জরিপ; মে-২০১৬) অটিজমের ভয়াবহতা প্রতিভাত হয়েছে-সনাক্তকৃত ২,৪৭,০৩৬ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৪৬,৫৬৯ জন অটিজম আক্রান্ত। বাস্তবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। যদিও ২০১১ইং তে অটিজম এবং অন্যান্য নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার্স বিষয়ে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর অটিজম বিষয়ে অনেক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তারপরও অনেক পরিবার এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়।

অনেক পিতা মাতাই না বুঝে অথবা সামাজিক লজ্জায়, বিভিন্ন কুসংস্কার-এর জন্য অটিজম আক্রান্ত সন্তানকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখছেন; অথবা জানেন না কোথায় যেতে হবে। তাই সামাজিক সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুবিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট মাতুয়াইল, চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকার বেশকিছু বেসরকারি হাসপাতাল, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সিআরপি, সুইড-বাংলাদেশ, প্রয়াস, আশার আলো, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং ঢাকা ও

চট্টগ্রাম শহরে অভিভাবকদের প্রচেষ্টায় বেশ-কিছু প্রতিষ্ঠান অটিজম সনাক্তকরণ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে।

অটিজম যদিও সম্পূর্ণভাবে নিরাময় যোগ্য নয়, বহুমাতৃক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেককেই সামাজিক মূলধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন Special Educare, Child phychologist, Occupational therapist, Behavioral therapist, Speech Language Therapist-- মানসম্পন্ন বিশেষায়িত স্কুল, ইত্যাদি এবং সাধারণ স্কুলেও পড়াশুনার সুযোগ। তাই প্রয়োজন শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণ এবং সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি। ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে

কর্মক্ষম করে তোলা; প্রাপ্ত বয়স্কদের দক্ষতা অনুযায়ী চাকুরি প্রদান; পিতা-মাতা/ অভিভাবকের অবর্তমানে পরনির্ভরশীল অটিজম আক্রান্তদের পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ সরকার সকল প্রতিবন্ধীদের মত অটিজমকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে, 'অটিজম এবং অন্যান্য নিউরোডেভালোপমেন্টাল ডিজঅর্ডার' বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা মিসেস সায়মা হোসেনের নেতৃত্বে এবং দিকনির্দেশনায় অনেকগুলো মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে অটিজম আক্রান্তদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ তথা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। 'অটিজম এবং অন্যান্য নিউরোডেভালোপমেন্টাল ডিসঅর্ডার-ট্রাস্ট' আইন প্রণয়ন; National Strategic Plan for Neurodevelopmental Disorders 2016-2021 এবং এর প্রেক্ষিতে "অটিজম ও স্নায়ুবিকাশগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তিগণের জন্য একবছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা'র উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সঠিক বাস্তবায়ন হলে দেশের সব এলাকার অটিজম আক্রন্তরা সঠিক সেবা পাবে এবং সমাজের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে। 'সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে এবং বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসতে হবে অটিজম আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তি তথা পরিবারকে সহযোগিতার জন্য।

'আমার সন্তান অটিজম আক্রান্ত'- এটা লজ্জার বা পাপের বিষয় নয়, কারণ অটিজম হওয়ার জন্য পিতা-মাতা দায়ী নয়। আসুন সবাই সচেতন হই, অটিজম আক্রান্ত সন্তানকে লুকিয়ে না রেখে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর সঠিক পরামর্শ নিয়ে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।

অনলাইন কোর্সের সাতকাহন

ডা. ওমর ফারুক
৫১তম এমবিবিএস, উপদেষ্টা, সন্ধানী, চমেক

সময়স্বল্পতা ও দূরত্বকে জয় করার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে অনলাইনে বিচিত্র সব কোর্স চালু আছে। এসব কোর্সে অংশগ্রহণ করে নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি পছন্দের বিষয়ে জানাশোনার পরিধিও বিস্তৃত করা যায়। এর জন্য চাই স্মার্টফোন/ ট্যাব/ পিসি আর ভালো ব্যান্ডউইথের ইন্টারনেট সংযোগ, সাথে কোস শেষ করার মানসিকতা।

এক. কোথায় পাব তারে : সাইট ও সার্চ ইঞ্জিন

ক্লাস সেন্ট্রাল, MOOCSE ইত্যাদি গুগল, ইয়াহুর মতই সার্চ ইঞ্জিন। পছন্দের কোর্স খুঁজে পেতে এসব সার্চ ইঞ্জিন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কেউ চাইলে অবশ্য ফিউচার লার্ন, কোর্সেরা, ক্যানভাস ইত্যাদি সাইট থেকে সরাসরি বিষয় বাছাই করে কোর্সে অংশ নিতে পারেন।

দুই. ডাউন দ্য র‍্যাবিট হোল: নিবন্ধনের নিয়মাবলি

ই-মেইল বা ফেসবুকের মাধ্যমে লগ-ইন করা গেলেও ই-মেইলই সুবিধাজনক। কারণ একসাথে একাধিক কোর্সে নিবন্ধন (এনরোল/ তালিকাভুক্তি) করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ই-মেইলের মাধ্যমে কোর্সের সময়সূচি মনে করিয়ে দিবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করতে হতে পারে, যাচাই-বাছাই শেষে কর্তৃপক্ষ কোর্সে প্রবেশের অনুমতি দিবে।

তিন. সে এক রূপকথারই দেশ : কোর্সের বিষয়াবলি

বিষয় বৈচিত্র্যে অনলাইন কোর্সের তুলনা নেই। মেডিক্যালের যেসব বিষয়ে সরাসরি হ্যান্ডস-অন প্র্যাকটিসের প্রয়োজন পড়ে না সেসব বিষয়ই মূলত অনলাইনে শেখার সুযোগ আছে। যেমন: সাইকোলজি, প্যালিয়েটিভ কেয়ার, জেনেটিক্স, বায়োইনফরমেটিকস, ইমেজিং ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব কোর্সের জন্য হ্যান্ডস-অন প্র্যাকটিস বাধ্যতামূলক তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করে নিতে হবে।

চার. ঝরা পাতা ঝড়কে ডাকে: সময়সীমা

যে সপ্তাহের ক্লাস সে সপ্তাহেই শেষ করা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিটি কোর্সের সময়সীমা আছে: কয়েক সপ্তাহ থেকে শুরু করে কয়েক বছর। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কোর্সটি আর্কাইভ করে রাখা হয় যাতে কোর্স ম্যাটেরিয়ালে প্রবেশের সুযোগ থাকতে পারে আবার নাও পারে। মেয়াদ শেষে আপনি কোনো ধরনের অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ফিউচার লার্ন ইদানীং সুনির্দিষ্ট কিছু কোর্সে সীমিত সময়ের জন্য প্রবেশাধিকার দিচ্ছে অর্থাৎ মেয়াদ শেষে কোর্স ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করে অ্যাসেসমেন্ট কোনো কিছুতেই আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না।

পাঁচ. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ: খরচপত্র

ফ্রি এবং ক্রেডিট-এলিজিবল দুই ধরনের অপশনই আছে। কয়েক হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকার কোর্স আছে। আপনার পছন্দসই। ক্রেডিট ট্রান্সফারের আগে নিরাপত্তার বিষয়টি যাচাইবাছাই করে নেয়ার অনুরোধ রইল।

ছয়. ফণীমনসার কাঁটা মেখে আছে স্নিগ্ধ শিশিরে: সার্টিফিকেট

দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকল কোর্সের ক্ষেত্রেই অ্যাসেসমেন্ট শেষে পাস করলে সার্টিফিকেট দেয়া হয়। সার্টিফিকেট পেতে চাইলে ক্রেডিট গুনতে হবে। শুধু সফটকপি চাইলে খরচ কিছু কম পড়বে। তবে ডিপ্লোমা বা তদুর্ধ্ব কোর্সের ক্ষেত্রে শুধু সফটকপি কেনার সুযোগ নেই।

সাত. এই কথাটি মনে রেখ: মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোর্স ম্যাটেরিয়ালে ফ্রিতে পেলেও সার্টিফিকেট/ স্বীকৃতি চাইলে টাকা গুনতে হবে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কোর্স কন্টেন্টে প্রবেশাধিকার থাকে না। ইন্টারনেট কানেকশন দুর্বল হলে ভিডিও স্ট্রিমিং ভাল হবে না, সময় নষ্ট হবে। এসব মুদ্রার ওপিঠ।

কোনো বিষয়ের গভীরে যেতে চাইলে অধুনা এসব কোর্সের ভূমিকা হেলাফেলা করার মত নয়। প্রতিটি কোর্সেই নতুন কিছু না কিছু শেখার সুযোগ আছে। ইতিমধ্যে লব্ধ জ্ঞানের পুনর্মূল্যায়ন হলেও ক্ষতি কী! বাড়তি পাওনা হল, সিভি/ রিজিউমে সংযুক্তি হিসেবে এসব উল্লেখ করা যায়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখনো সংযুক্তির এই আইডিয়াটি তেমন জনপ্রিয় নয় যদিও, তবু চাকুরির বাজারে আখের গোছাতে প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে কোর্স করা থাকলে ইতিবাচক কোনো ফল আসতেও পারে। তা ছাড়া আপনি যে সবসময় শেখার মধ্যে আছেন তাও পরোক্ষভাবে তুলে ধরার মোক্ষম উপায় এসব কোর্স।

কেউটে

ডা. আসির মোসাদ্দেক সাকিব
২৩তম বিডিএস

ঠাস করে এই বেগুনী মার্বেলটাও ফাটে। লাফিয়ে চিৎকার করে হাততালি দিয়ে উঠে টুম্পা। প্রতিপক্ষ শহিদ আর মানিক গম্ভীর হয়ে উঠে। "ধ্যাত বেটি তোরে আর খেলন লাগব না যা"- বলে টুম্পাকে ধাক্কা দেয় মানিক। মাটিতে পড়ে যায় টুম্পা। মানিক তার চেয়ে বড় আর ষণ্ডামার্কা বলে প্রথমে কিছু বলার সাহস পায় না। মনে মনে গালি পাড়তে পাড়তে মাটি থেকে উঠে বাবার আদেশে পরা কালো হিজাব আর পাজামায় লাগা মাটি ঝাড়তে থাকে। এই ৫ বছরের মেয়ের মার্বেল খেলায় হাতের আঙুলের নিশানা নির্ভুল। এলাকার তাবৎ সমবয়সী এবং কয়েক বছরের বড়রা পর্যন্ত তার সাথে পেরে ওঠেনা সহজে। ফলস্বরূপ ২টা তিন লিটারের প্লাস্টিক বোতল ভর্তি মার্বেল তার অর্জনের থলিতে থাকে সবসময়।

"মানিক্যা আবার ধাক্কা দিলে কিন্তু খবর আছে কইলাম" পুষে রাখা রাগ হঠাৎ বেরিয়ে আসে টুম্পার মুখ দিয়ে। "কি কইলি? কারে রাগ দেহাস তুই কুত্তা? দাঁড়া।" হেরে যাওয়া তার একদম সহ্য হয় না।

ধুপ করে মানিকের বুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ইকবাল আর এক হাতে টুম্পাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। "হালার বাইনচোত, তোরে একবার মানা করছি না যে টুম্পার গায়ে হাত দিবি না? গায়ে বল আইছে না? বিষ উঠছেনি হালারপো?" ধপাধপ দুইটা লাথি পড়ে মানিকের পিঠে। মানিক আর এদিক-ওদিক না করে ওঠে দৌড় লাগায়। সাথে শহিদও পড়িমড়ি করে পালায় পিছে পিছে।

ইকবাল আনসারি এই এলাকার চেয়ারম্যান কামরুল আনসারির ছোট ছেলে। ফিটফাট হয়ে চলে, ৩০০ সিসি হোন্ডা চালায়। বন্ধু-মহলে সেরা চেইন স্মোকার হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়। পড়াশোনার ধারেকাছে নেই। বাপের গরুর খামারের দেখাশুনার দায়িত্ব আপাতত তার। হোন্ডা নিয়ে রাতবিরাতে এলাকা টহল দেয়। তবে টুম্পার প্রতি খুব স্নেহপরায়ণ আচরণ করে সে। টুম্পাও বড় ভাইয়ের মত মানে ইকবালকে। "উঠ, তোরে নামায় দিয়া আসি চল। এই সব চ্যাংড়া-প্যাংড়া পোলার লগে আর খেলতে আইবিনা কইলাম।"

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে টুম্পা। যদিও এর আগে টুম্পাকে হোন্ডায় করে বাসায় নামিয়ে দেয়া নিয়ে টুম্পার বাবা সালেহ আহমদ প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিল তবুও এই মুহূর্তে টুম্পা আবারো একই পদ্ধতিতে গৃহাগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। ইকবালের কথায় টুম্পাকে সামনে বুকের কাছে গা ঘেঁষে বসিয়ে হোন্ডা স্টার্ট দেয় ইকবাল....

"উঠনারে বইন, এতক্ষণ ঘুমাইনি কেউ? রাতা ডাক মারসে সেই কবে। হুজুর গোসা অইব তো, মারব ত তোরে...উঠ না" হালকা গা ধরে নাড়া দেয় রাহেলা। বয়সে ৯ বছরের বড় টুম্পার বোন রাহেলা, মায়ের রেশ ধরে দুই বোনই ডাগর চোখ, দীর্ঘ ঘন চুল আর দুধে আলতা গায়ের রঙ পেয়েছে। তবে ছোট বোন টুম্পা বাবার চটপটে আর এক রোখা স্বভাবটা পেয়েছে যেটা রাহেলার ঠিক উল্টো। হেমন্তের ভোরগুলোতে বড় আলসেমি পেয়ে বসা শুরু করে টুম্পাকে। জানালায় ঘুণে খাওয়া ফুটোটা দিয়ে আসা মিষ্টি রোদটা যেন মাথায় হাত বুলিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা বছরের কেবল এই সময়টাতে হয় টুম্পার। তবু মাদ্রাসার হুজুরের বেতের কথা মনে পড়ায় কাঁথাটা সরিয়ে উঠে বসে বিছানায়। গেল বছর বাবা মির্জাপুর আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলো তাকে। বড় হুজুরের তীক্ষ্ণ চোখ, দাগ কাটা লম্বা বেত। রাশভারী গলা আর কঠোর নিয়মের তাগিদে আম পারাটা টুম্পার প্রায় ঠোঁটস্ত এখন। কিছুদিন পরেই কোরআন পড়া শুরু হবে তার, বলেছে হুজুর। টুম্পার মা ফযরের নামাজ পড়েই দ্রুত খাবার তৈরি করে রাখে টুম্পা আর বাবার জন্য। টুম্পার বাবা খেয়েদেয়ে নিজের চালানো সিএনজিতে করে টুম্পাকে মাদ্রাসার মেঠোপথটার সামনে নামিয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দ্রুত ট্রেন স্টেশনের দিকে চালিয়ে নেয় গাড়ি। সেখান থেকে আধা কিলো হাঁটলেই মাদ্রাসা। আজ প্রায় ১০ বছর ধরে সিএনজি চালায় সালেহ আহমেদ। এর আগে শহরে প্রিন্টিং প্রেসে চাকরি করত। প্রেসের মালিক খুবই নির্দয় আর ঝামেলার লোক। এই সেই বাহানা দেখিয়ে প্রায়ই বেতন কেটে রাখতো। তাই চাকরি ছেড়ে ৩ মাস ড্রাইভিং শিখে আল হেলাল কোম্পানির সিএনজি চালানো শুরু করে। ৭ বছর ধরে বিভিন্ন কোম্পানির গাড়ি বদলে সংসারের খরচ টেনেটুনে সামলিয়ে লাখ খানেক টাকা জমায় আর লাখ খানেক টাকা শ্যালকের কাছ থেকে ধার করে নিজেই একটা কিনে নেয় গাড়ি। ৩ মাস চালানোর পরে ইউনিয়ন নির্বাচন হামলায় গাড়ি ভাংচুর হয়। আবার ২০ হাজারের ধাক্কা। তাও কোনো মতে ধারদেনা করে মেরামত করে আজ পর্যন্ত চলে

আসছে। ঘণ্টা দুই পরে ছুটি হয় টুম্পার। যেতে হয় পাড়ায় ছেলেমেয়েদের সাথে। উত্তরীয় হাওয়া শুরু হবার দিন এখন। মেঠো পথটা হলদে খয়েরী রেইনট্রির পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ার অবস্থা। আধ ফোটা ঢোলকলমির চিকন ডালগুলো হালকা হালকা দুলছে বাতাসে।

বাঁশতলায় শুকিয়ে যাওয়া ডোবার পাশে এক পেট ফোলা গর্ভবতী মেয়ে বিড়াল চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকে টুম্পার দিকে। মুখে চুক চুক শব্দ করে আদর করে ডাকতেই ভয়ে পালিয়ে ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় বেড়ালটা। পাশের গ্রামের রণবীর বণিক এপাশটায় জায়গা কিনে কিসের জন্য যেন মাটি ভরাট করেছিল। সেখানে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে বেশ। এক পাশটায় চাররঙা অনেক শটিফুল আর চার পাশে অনেক লাল ভেরেণ্ডা গাছ। বাড়ির কবরস্থানে এই গাছগুলো দেখেছে টুম্পা। ওদিকটায় গিয়ে জঙ্গল মাড়িয়ে দুটো শটি ফুল ছিঁড়ে আসে। এত সুন্দর ফুল হতে পারে? বিশ্বাস হয় না টুম্পার। অনেক দূর থেকে পাওয়ায় টিলারের শব্দ ভেসে আসছে। ভেঁক ভেঁক শব্দ করে হেলেদুলে রশিদ মাস্টারের বাড়ির রাজহাঁসগুলো টুম্পার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।

বাড়ির রাস্তার মোড় ফিরতেই দেখে ইকবাল আর তার এক বন্ধু হোন্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইকবাল এগিয়ে এসে টুম্পার মাথায় হিজাবের ওপর হাত বুলিয়ে দেয় আর সামনে হাঁটু গেরে বসে পড়ে। "আই টুম্পা একখান মজার জিনিস আনছে এই ভাই বিদেশ থেইক্যা তোর লাইগ্যা, দেখবি?"

হ্যাঁ-সূচক মাথা বাঁকায় টুম্পা ধীরে ধীরে। ইকবালের সাথের ছেলেটা পকেট থেকে বড় এক চকলেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দেয় টুম্পার দিকে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর বিকট হাসি দেখে নিতে সাহস করলো না টুম্পা।

'ডরাস ক্যানরে বইন? এইডা তোর আরেক বড় ভাই। আরে ল, ল। আদর কইরা কিছু দিলে লইতে হয়।

অন্যদিকে তাকিয়ে চকোলেট নিয়ে নেয় টুম্পা। তারপর অনেকটা দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি চলে আসে। রাতে পড়া শেষ করে রাহেলার মুখে ভূতের গল্প শোনে। কানটা ঝাঁ ঝাঁ করে টুম্পার ভয়ে। জানালার বাইরে শুকনো কলাপাতাগুলোকে শাঁকচুন্নির চুলের মত মনে হয়। ভাত খাবার পর ঘাটের নিচে তার ব্যক্তিগত টিনের বাক্স খুলে সব উল্টেপাল্টে দেখে আবার। সাদা আর নীল কাপড়ে বানানো কাকতাড়ুয়া আকৃতির পুতুল, দুই বোতল মার্বেল, কয়েকটা চুলের ব্যান্ড, পেট টিপে শব্দ করা বাঁদর, নীল আর হলুদ চুড়ি ১০টা, একটা আতরের শিশি, একটা রেডিওর বড় চুম্বক, গুলতি, অজিফা, ব্যাটারির বিমান, হঠাৎ ইকবালের দেয়া চকোলেটের দিকে চোখ পড়ে। প্রায় নিঃশব্দে প্যাকেট দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে এক কামড় খায়। অদ্ভুত রকমের মিষ্টি!! অর্ধেকটা খেয়ে ফেলে টুম্পা। মিষ্টির প্রতি দুর্বলতা আছে তার। মার ডাক শুনে বাকিটা দ্রুত প্যাকেটে প্যাঁচিয়ে বাক্সে রেখে শুয়ে পড়ে। পাশের ঘরে ঘররর ঘররর করে বাবা নাক ডাকছে। বাবার এই স্বভাবটা একদম ভালো লাগে না টুম্পার। অনেকক্ষণ ঘুম আসে না শব্দে। আজ সকালে উঠেই ম্যাজম্যাজ করেছিল গা'টা। গতকাল মা মানা করার পরেও ১ ঘণ্টা পুকুরে হুড়োহুড়ি করে পার মেয়েদের সাথে। আজ সকাল সকাল মা'র বকুনি। টুম্পার বাবা এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। এসব কারণে বাবাকে আবার অনেক ভালো লাগে টুম্পার। আজ মাদ্রাসায় হুজুরের কাছে কোরআন শুরু করবে বলে বাবা কাল নতুন কাপড় কিনে এনেছে রাতে। চকচকে সবুজ হিজাব, সবুজ কমলা হলুদ মেশানো সালোয়ার কামিজ। ভারী পছন্দ হয় টুম্পার। তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ভাঙা আয়নাটায় একবার দেখে আসে। বাহ! আসলেই সুন্দর তো কাপড়টা! কিন্তু আজ নাকি বাবার সাথে যাওয়া হবে না। সালেহ আহমেদ তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছে গাড়ি নিয়ে। মা বলল শহরে বিলেতগামী এক পরিবার ভাড়া করেছে বাবার গাড়ি। তাই ভোরেই যেতে হল তড়িঘড়ি করে। যাবার আগে বাক্স খুলে সাদা নীল কাপড়ের পুতুলটাকে হাত বুলিয়ে কী যেন বলে দিয়ে যায় ক্ষীণ করে হেসে। পকেটে করে আধ খাওয়া চকোলেট নেয় আসার সময় খাবে ভেবে। আর কাগজে বেঁধে ১০টা মার্বেল নেয় গোপনে। গতকাল পিংকি আর শিফার সাথে চুক্তি হয়েছে যে আজ খেলবে ছুটির পরে। একাই বেরুলো টুম্পা। "আল্লার নাম লইয়া যা মা। তাড়াতাড়ি আইয়া পড়িস কিন্তু" টুম্পার মার গলা শুনা যায়। বাতাসটা একটু ঠান্ডা আজ। গা-টা ম্যাজম্যাজ করলেও মনটা ভালো টুম্পার। আজ হাঁটার পথটাও লম্বা।

পথে দুয়েকটা গ্রাম্য মুদির দোকান আর পান সিগারেটের দোকান পড়ে তবে এত সকাল সকাল খুলেনা এগুলো। সাদা দাড়ির কয়েকজন মুরব্বিরা দেখা যায় রাস্তায় শুধু। বাঁশতলা পার হবার সময় দূর থেকে হোন্ডার আওয়াজ শোনা যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সামনে এসে দাঁড়ায় ইকবাল। সাথে দুইজন সাদা লুঙ্গিপড়া লোক। একজন সেই আগের দিনের ছেলেটা, আর একজন অপরিচিত। এভাবে অকারণে এত সকালে ইকবাল কখনো আসেনি। তাই প্রথমে একটু অবাক হয় টুম্পা। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই তাদের অস্বাভাবিক রকমের লাল চোখ দেখে ভয় পায়। লুঙ্গিপড়া দুইজন কিসব যেন বলাবলি করে বিকট শব্দে শেয়ালের মত বিশ্রিভাবে হাসছে।

"টুম্পা একটু এদিকে আয়, কথা শুইনা যা বইন" ইকবাল হাসতে হাসতে বলে। আবার পিছনে ফিরে বাকি দুইজনের দিকে তাকিয়ে হাসে। টুম্পা আসে না। বুকের ভেতর ধুপধুপ করছে

কেন জানি তার। "একখান বই লবি? এইখান আমি দিতেসি, ডরাইস না।" নিতে না চাইলেও ইকবাল তার হাতে জোর করে ধরিয়ে দেয় একটা চকচকে মলাটের বই। খুব দ্রুত ৪/৫ পৃষ্ঠা উল্টায় টুম্পা। সবপৃষ্ঠা জুড়ে ফর্সা ফর্সা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো আর বসা কিছু নগ্ন ছেলেমেয়ের ছবি দেখে থরথর করে হাত কাঁপকে থাকে টুম্পার। দুই কান উষ্ণ হয়ে লাল হয়ে উঠে। কপালে ঘামের বিন্দু জমে। "এইডা কিতা দিছ? শরম নাই তোমার?" বলে রাগান্বিত স্বরে জবাব দিয়ে ছুড়ে ফেলে বইটা ইকবালের গায়ের উপর। তিনজনেই অদ্ভুত বিশ্রিভাবে অশ্রুভঙ্গি করে হাসতে থাকে। এই পরিচিত স্নেহপরায়ণ বড় ভাইকে হঠাৎ কেমন যেন অচেনা মনে হয় টুম্পার। দ্রুত দৌড় দেয় মেঠো পথের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে হিজাব ধরে টান দেয় কেউ। গলায় টান খেয়ে পিছনে উল্টে পড়ে মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খায় টুম্পা। ব্যথায় ককিয়ে কেঁদে উঠে। একজন সাদা লুঙ্গিওয়ালা পকেট থেকে লম্বা মাফলার বের করে মুখের চারপাশে চেপে শক্ত করে দুই তিন পাক দিয়ে বেঁধে দেয়। কান্নার শব্দ দশ ফুট দূরেও আর শোনা যাচ্ছে না। টুম্পা বুঝতে পারে না কী হচ্ছে। বুকের স্পন্দন প্রচণ্ড জোরে শুরু হয়েছে। আজ তাকে বাঁচাতে আসছেনা কেন তার ইকবাল ভাই, বুঝে না সে। আরেক সাদা লুঙ্গিওয়ালা এসে একটানে তার চকচকে সবুজ হিজাব খুলে নেয়। ঘন কালো দেড় ফুট লম্বা চুল এলিয়ে পড়ে। গলার পাশে কানের নিচে ছিঁড়ে যায় তার। ভয়ে জোরে চিৎকার করে টুম্পা। মাফলারের ঘন উলের ফাঁকে সেই শব্দ আটকে যায়। তার ছোট ফর্সা হাত দুটো একহাতের শক্ত বিরাট তালুতে আটকে ধরে ইকবাল। একমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় টুম্পা। এটা কি আসলেই ইকবাল ভাই? বিশ্বাস হয় না তার। একটানে তার পায়জামা খুলে নেয় ইকবাল। কোমরের চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তড়পাতে থাকে সব শক্তি দিয়ে টুম্পা। কেউ একজন ঘাড়টা চেপে রাখায় পিছনে ফিরার সাধ্য নেই আর। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে থেকে শুরু করে কোমর পর্যন্ত খোঁচা খোঁচা দাড়ির গুতো খায়। এরপরই তলপেটের নিচে অসহ্য রকমের ব্যথা অনুভব করে। মনে হয় উরু দুটোকে দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো কেউ। চিৎকার করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই টুম্পার। মা প্রায় সব সময় জাহান্নামের গল্প শুনাতো কোলে তার মাথা রেখে। ৭টা জাহান্নাম। এত শত না বুঝলেও জাহান্নাম যে প্রচণ্ড কষ্ট দেয় সেটা অন্তত বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ কি আজ তাকে সেই জাহান্নামে দিলো? কোন দোষে? এত ব্যথা কেন দিচ্ছে তাকে? মানুষ কি মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারে? আল্লাহ না-চাইলে তো কিছু হয় না বলেছিল হুজুর। শিফার বাপ তো সবাইকে "জাহান্নামি" বলে গালি দেয়। কিন্তু তাকে তো কখনো দেয় নাই!! তবে কি সবজিখেতে মুরগিকে সেদিন ঢিল মারায় আল্লাহ জাহান্নামে দিল? সাদা নীল পুতুলটাকে বাক্সে রাখায় জাহান্নামে দিলো? বড়শি দিয়ে রুই মাছের বাচ্চা ধরায় জাহান্নামে দিলো? চোখভর্তি মাটি লাগাতে দুনিয়া আর জাহান্নামের ফাঁরাকটা দেখতে পাচ্ছে না টুম্পা, "আল্লাহ আমারে এই বারের মতো মাফ কইরা দেও না আল্লাহ, অনেক গুনাহ করছি রে খোদা.... আমি আর মাছ ধরুম না, ঢিল মারুম না আল্লাহ...আজ থেইক্যা তোমার কোরআন পড়ুম আল্লাহ সারা জীবন .... দোয়া পইড়া বাইর অমু....আমার বাপরে একটু আইন্না দেও না আল্লাহ.... বাপে আমারে লইয়া যাইব তো, আমার মায়ে বহুত সোহাগ করে তো আমারে... একবার আইন্যা দেও আল্লাহ...একবার।"

আরো ২০ মিনিট কেটে গেলো। টুম্পা প্রায় সংজ্ঞাহীন। বাঁশতলায় বসে ইকবাল শার্ট খুলে বিড়ি ফুঁকছে। সাদা লুঙ্গিওয়ালা একজন শুকনা ডোবার পাশে প্রস্রাব করছে, আরেক জন রক্তাক্ত সাদা লুঙ্গি পাল্টে প্যান্ট পরছে। উল্টো হয়ে পড়ে থাকা, পাঁজরের হাড় আর জঙ্ঘাস্থি ভাঙা টুম্পার সুখের ঝলা বেয়ে রক্ত পড়ছে। শুভ্র উদোম কোমর থেকে পা পর্যন্ত রক্ত আর কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। তিনজন সুপুরুষ কিছুক্ষণ কী-যেন আলাপ করল নিজের ভিতর, তারপর একজন সবুজ হিজাবটা দড়ির মতো পাকিয়ে টুম্পার, গলায় পেঁচিয়ে প্রচণ্ড টেনে রাখে কিছুক্ষণ। গলার তরুণাস্থি ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায় টুম্পার। টুম্পা কিন্তু এবার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেনি নীলসাদা পুতুলটার মতো। ইকবাল কোথা থেকে শাবল এনে গর্ত খুঁড়তে থাকে। টুম্পার দেহটা মাথা থেকে অর্ধেক গর্তে রেখে বুক পর্যন্ত মাটি চাপা দিয়ে দেয়। বাকি অর্ধেক ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে থাকে উপরে। দুই হাতের দক্ষ মার্বেল খেলুড়ে লালচে আঙুলগুলো চিংড়ি মাছের মতো হঠাৎ দু একটা কাঁপুনি দিয়ে নিথর হয়ে যায়। হোন্ডার শব্দ আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়। টুম্পার পাশে এলোমেলো হয়ে দশটা মার্বেল ছড়িয়ে থাকে। গর্ভবতী বিড়ালটা টুম্পাকে আজ আর ভয় পায় না। পাশ বসে নিজের পা উপরে তুলে সাফ করতে থাকে জিভ দিয়ে। মাদ্রাসা ছুটি হয়। কোলাহল করে বাচ্চারা বেরুচ্ছে।

পিংকি আর শিফা মার্বেল নিয়ে কাঁঠাল গাছ তলায় তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী টুম্পার জন্য অপেক্ষা করে...মেঠো পথের ঢোলকলমি গাছগুলো ঠান্ডা বাতাসে দোলে। টুম্পার বালিশের উপর হেমন্তের মিষ্টি রোদ অপেক্ষা করে, টিনের বাক্সে পুতুলটা, শব্দ করা বাঁদরটা, চুলের ব্যান্ডগুলো, কোরআনের প্রথম অক্ষরগুলো টুম্পার জন্য অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করতে-করতে অধৈর্য হয়ে ওঠে প্লাস্টিক বোতলের মার্বেলগুলো। প্রাত্যহিক রোদের আগমন ম্রিয়মাণ কুয়াশার সাথে দূর থেকে একটা ক্রমবর্ধমান সিএনজির শব্দ শোনা যায়।

(সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা অবলম্বনে চরিত্র ও স্থান পরিবর্তিত গল্প)

টোকাই

ডা. ফায়েমা ফার্মি
২৩তম বিডিএস

আমি যখন মেডিকেল 2nd year পড়ি সময়টা তখন ২০১৩। জি,ই,সি মোড়ের পাশে এক বাসায় টিউশন করতাম। অভিজাত family -দেড়কোটি টাকার ফ্লাট বাসা, পাজেরো গাড়ি বাসায় তিনটা, প্রাইভেট কার একটা। সবগুলোই ছিল নিজেদের ব্যবহারের জন্য। ক্লাস three, four-এর দুইজন British Curriculam এর ছেলে বাচ্চাকে পড়াতাম। এলাকাটা কাছে বলে হেঁটেই যেতাম। ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। ফুটপাত দিয়ে যখন আসতাম, আমাদের মেডিক্যালের ফরেনসিকের (মর্গ) সামনে ডাস্টবিনটাতে কুকুরের সাথে পাল্লা দিয়ে সাত থেকে দশ বছরের কিছু বাচ্চাকে খাবার খুঁজতে দেখতাম। অথচ রাস্তায় চলমান প্রত্যেকটা পথচারী নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ঐ জায়গাটা পার হত, অবশ্য আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। এলাকার নামিদামি ১২ টা প্রায় রেস্টুরেন্ট এই জায়গায় রাস্তার দুইধারে। পচাবাসি, উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো এই ডাস্টবিনেই ফেলা হতো। একদিন যখন এই পথে হেঁটে আসছিলাম, প্রায় সাতবছরের একটা মেয়ে আমার অ্যাপ্রোনে টান মেরে বারবার আবদার করছিল; "আপু দশটা টাকা দ্যান, ভাত খামু"। মাঝেমাঝে এসব বাচ্চার এমন কাপড় টানাটানি অনেক বিরক্ত লাগে সত্যি। কিন্তু ঐ দিন টোকাই ঐ মেয়েটার প্রতি অনেক মায়া লাগছিল। অবশ্য এরও কিছু কারণ ছিল, মেয়েটার চোখ ছলছল করছিল, চোখের পাপড়িগুলো ফোলা ছিল। কাঁধে হাত রেখে বললাম, চল্। সে হাঁটতে হাঁটতে ইমারজেন্সি পর্যন্ত এসেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী তোর? সে বলল আনিকা।

আমি -- কোথায় থাকিস?

আনিকা -- পার্কে।

আমি ---- কাঁদছিলি কেন?

আনিকা --- সকালে একটা কেক খাইছি। বিকাল পর্যন্ত ৫০ টাকা ভিক্ষা করছি। সন্ধ্যায় আর এক টোকাই ছেলে তা কেড়ে নিছে। খিদের চোটে ফুটপাতের দোকানে চুরি করছি। পরে ধরা পড়ে আমাকে দোকানদার মাইরধর করছে। ব্যথায় কানছি।

(বি : দ্র : সে local language কথাগুলো বলছিল)

আমি---স্কুলে যাস্ না?

আনিকা-- না।

আমি --- তোর মা বাবা নাই?

আনিকা--- বাবা নাই। মা আছে।

আমি --- মা কী করে?

আনিকা--- নতুন বাপের সাথে থাকে। আমারে ভাত দেয় না। বলছে ভিক্ষা করে খাইতে।

(বি: দ্র: এগুলোও সে local language বলছিল)

আমরা ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে ইমারজেন্সি পর্যন্ত চলে এসেছি। আমি ওকে বললাম তোর ভাত খেতে কত লাগেরে। সে বলল বিশ টাকা। পকেট থেকে আমার রিকসা-ভাড়ার পুরা টাকাটাই ওকে দিয়ে দিলাম। সে তৎপর হয়ে টাকাটা নিয়ে চলে গেল।

জীবন কত নির্মম। যে-বয়সে এই আমরা মায়ের বুকে ঘুমাতাম, খেতে অনীহা ছিল বলে মা রাজ্যপুরীর গল্প শুনিয়ে মুখে খাবার দিত; ঝড়বৃষ্টি তো দূরে থাক, সামান্য বাতাসে ঠান্ডা লাগবে বলে কোলের মধ্যে আগলে রাখত; চোখের কোণে এককোটা জল দেখলে প্রিয় বাবা পার্কে ঘোরাত, একরাশি চুমু দিয়ে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বুকের মাঝে জড়িয়ে নিত; ঠিক একই বয়সে এই টোকাইদের জীবনপথ এর উলটো। ডাস্টবিনের পচা খাবারে তার খিদার নিবারণ। ঝড়বৃষ্টিতে তার গাছতলা অথবা কোনো ফুটপাত আশ্রয়। খিদের জ্বালায় সে চুরি করে। জীবন তাকে জন্মের পর থেকেই কতটা রূঢ় তা দেখায়। কাঁটাযুক্ত এ পথে পথ চলতে শেখায়। আসলে সত্যি বলতে কী "বিড়াল সাধে গাছে উঠে না। কুকুর তাড়া করলে তারপর ওঠে।" আর একটা কথা "আমাদের ঘরে কুকুর বিড়াল যখন চুরি করে খাবার খায়, আমরা বিরক্ত হই, তাদের খারাপ বলি, মাইরধর করি, কিন্তু আমরা ভুলে যাই তাদের পেটেও খিদা থাকে। খিদার জ্বালায় তারা চুরি করে।" এই টোকাইরা হয়তো বড় হয়ে চোর, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী হয়। সামান্য টাকার জন্য বোমাবাজি করে, ভাড়া করা খুনী হয়। অবশ্য তাও স্বাভাবিক হবে না কেন বলেন - রূঢ় জীবন তাদেরকে রূঢ় তা বেছে নিতে বাধ্য করে। সমাজ না রাখে এদের কোনো খোঁজ, সরকার না নেয় কোনো কঠিন পদক্ষেপ। সেলফ তাকের ময়লা আচ্ছন্ন বই-এর মতো এরা পড়ে থাকে, কেউ কখন খুলেও দেখে না। অথচ, একটু সহযোগিতায় এ রকম সহস্র আনিকা হতে পারত সমাজসেবী ডাক্তার, হতে পারত শেরেবাংলা, শেখ মুজিব, জগৎখ্যাত রবীন্দ্রনাথ, আর সেরার সেরা সেই আইনস্টাইন, বিজ্ঞানী নিউটন।

May Allah Bless them.

সময় যখন থমকে দাঁড়ায়

সৈকত বড়ুয়া
৫৬তম প্রজন্ম

মানুষের প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি সৃজনে কোনো-না-কোনো নেপথ্য জড়িয়ে থাকে। যেমন, বৃক্ষ ভূ-গর্ভে বিস্তৃত করা শিকড়ের উপর ভিত্তি করেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বছরের পর বছর; যুগের পর যুগ। তবে সময়ের রোষানলে পড়ে সে নেপথ্য নেপথ্যেই রয়ে যায়; আর কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। এর মূল কারণ সময়।

সময় বড়ই নিষ্ঠুর, নির্দয়, পাষণ্ড। তবে তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। স্বার্থপরতা সৃষ্টির ক্ষমতা। অবশ্য আপেক্ষিকতার বিচারে দুটি কাঠামোতে তাকে ফেলা যায় সুসময় এবং দুঃসময়।

সুসময়কে আকাশের বুকে খেলা করা কিছু মেঘের সারির সাথে তুলনা করা যায়। উড়ন্ত মেঘ যেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা জড়িয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়; চাতকের আনন্দ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ; তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত কবি মনে প্রাণের সঞ্চার করে। বিপরীতে প্রবল উন্মাদনায় বারিধারা বইয়ে তলিয়ে নিয়ে যায় গরিবের কুঁড়ে ঘরটুকুও, ঠিক তেমনি চাতক পাখির মতো মানুষ আশায় থাকে সুসময়ের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যেন ফুরোয়না। সেই সুসময়ের সাথে স্বার্থপরতার স্রোত যখন এসে মিশে তখন কাঙালের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত সে-স্রোত থেকে রেহাই পায় না।

দুঃসময় হচ্ছে সময়ের dormant stage অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থা। তখন সে স্বার্থপরতা সৃষ্টিতে অপারগ। তবে জন্মগত অধিকার হিসেবেও অনেকে স্বার্থপরতা অর্জন করে। সেক্ষেত্রে সময় আরও প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। দুঃসময়ের উপকারী দিকটা হলো এ-সময় মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, তার সত্তাকে চিনতে পারে, খালি চোখে নিজের বিবেকও সে দেখে।

স্বপ্নের সাথে সুসময়ের পার্থক্য একটাই। সুসময় বাস্তব এবং সীমিত আর স্বপ্নের কোনো সীমা নেই; বাধাধরা কোনো নিয়মও নেই। তবে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার নিয়ামক হলো তার দুচোখ ভরা স্বপ্ন। মাঝে মাঝে ভাবি, যদি স্বপ্নের বিশাল একটা শো-রুম দেওয়া যেত...। যেখানে ছোট-বড়, সস্তা-দামি বিভিন্ন রকম স্বপ্ন বিক্রি হবে তবে এ কথা ঠিক যে, খাদ ছাড়া যেমন সোনার গহনা হয় না, স্বপ্ন দেখতে হলেও তেমনি দুঃস্বপ্ন দেখার সাহস চাই। আমরা সবাই Hill Climbing নামে মোবাইল গেমটার সাথে কম-বেশি পরিচিত। এক-একটা লেভেল পার হওয়ার পর পাহাড়ি রাস্তাগুলোতে অনেক বড়-বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, কখনো উঁচু পাহাড়ের তুঙ্গে, কখনো ঢালু পাহাড় ভেসে একদম তলদেশে।

পাহাড়ের ঐ তুঙ্গগুলোকে যদি সেতু তৈরি করে যুক্ত করে দেয়া যায় তাহলে রাস্তা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ঠিক পাহাড়ের ঐ তুঙ্গরূপী সুসময়গুলোকে দুঃসময়ের সেতু তৈরি করে জীবনে চলার পথটাকে সহজ করে নিতে হবে।

লালন বলেন, "সহজ মানুষ খুঁজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে।" শেক্সপিয়র বলেন, 'আমি সব সময় নিজেকে সুখী ভাবি; কারণ আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না; কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

সময় যেহেতু পরিবর্তনশীল। সুতরাং পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো সহজ হয়ে বেঁচে থাকা। জীবন আসলে ফুটবল খেলার মতো। ফুটবল একটি সহজ খেলা, কিন্তু একে সহজভাবে খেলাটাই অনেক কঠিন। বেঁচে থাকাটা সহজ; মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাটা অনেক কঠিন।

লালন বলেন, "সহজ মানুষ খুঁজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে।" শেক্সপিয়র বলেন, 'আমি সব সময় নিজেকে সুখী ভাবি; কারণ আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না; কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

সময় যখন থমকে দাঁড়ায়

সৈকত বড়ুয়া
৫৬তম প্রজন্ম

মানুষের প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি সৃজনে কোনো-না-কোনো নেপথ্য জড়িয়ে থাকে। যেমন, বৃক্ষ ভূ-গর্ভে বিস্তৃত করা শিকড়ের উপর ভিত্তি করেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বছরের পর বছর; যুগের পর যুগ। তবে সময়ের রোষানলে পড়ে সে নেপথ্য নেপথ্যেই রয়ে যায়; আর কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। এর মূল কারণ সময়।

সময় বড়ই নিষ্ঠুর, নির্দয়, পাষণ্ড। তবে তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। স্বার্থপরতা সৃষ্টির ক্ষমতা। অবশ্য আপেক্ষিকতার বিচারে দুটি কাঠামোতে তাকে ফেলা যায় সুসময় এবং দুঃসময়।

সুসময়কে আকাশের বুকে খেলা করা কিছু মেঘের সারির সাথে তুলনা করা যায়। উড়ন্ত মেঘ যেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা জড়িয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়; চাতকের আনন্দ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ; তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত কবি মনে প্রাণের সঞ্চার করে। বিপরীতে প্রবল উন্মাদনায় বারিধারা বইয়ে তলিয়ে নিয়ে যায় গরিবের কুঁড়ে ঘরটুকুও, ঠিক তেমনি চাতক পাখির মতো মানুষ আশায় থাকে সুসময়ের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যেন ফুরোয়না। সেই সুসময়ের সাথে স্বার্থপরতার স্রোত যখন এসে মিশে তখন কাঙালের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত সে-স্রোত থেকে রেহাই পায় না।

দুঃসময় হচ্ছে সময়ের dormant stage অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থা। তখন সে স্বার্থপরতা সৃষ্টিতে অপারগ। তবে জন্মগত অধিকার হিসেবেও অনেকে স্বার্থপরতা অর্জন করে। সেক্ষেত্রে সময় আরও প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। দুঃসময়ের উপকারী দিকটা হলো এ-সময় মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, তার সত্তাকে চিনতে পারে, খালি চোখে নিজের বিবেকও সে দেখে।

স্বপ্নের সাথে সুসময়ের পার্থক্য একটাই। সুসময় বাস্তব এবং সীমিত আর স্বপ্নের কোনো সীমা নেই; বাধাধরা কোনো নিয়মও নেই। তবে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার নিয়ামক হলো তার দুচোখ ভরা স্বপ্ন। মাঝে মাঝে ভাবি, যদি স্বপ্নের বিশাল একটা শো-রুম দেওয়া যেত...। যেখানে ছোট-বড়, সস্তা-দামি বিভিন্ন রকম স্বপ্ন বিক্রি হবে তবে এ কথা ঠিক যে, খাদ ছাড়া যেমন সোনার গহনা হয় না, স্বপ্ন দেখতে হলেও তেমনি দুঃস্বপ্ন দেখার সাহস চাই। আমরা সবাই Hill Climbing নামে মোবাইল গেমটার সাথে কম-বেশি পরিচিত। এক-একটা লেভেল পার হওয়ার পর পাহাড়ি রাস্তাগুলোতে অনেক বড়-বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, কখনো উঁচু পাহাড়ের তুঙ্গে, কখনো ঢালু পাহাড় ভেসে একদম তলদেশে।

পাহাড়ের ঐ তুঙ্গগুলোকে যদি সেতু তৈরি করে যুক্ত করে দেয়া যায় তাহলে রাস্তা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ঠিক পাহাড়ের ঐ তুঙ্গরূপী সুসময়গুলোকে দুঃসময়ের সেতু তৈরি করে জীবনে চলার পথটাকে সহজ করে নিতে হবে।

লালন বলেন, "সহজ মানুষ খুঁজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে।" শেক্সপিয়র বলেন, 'আমি সব সময় নিজেকে সুখী ভাবি; কারণ আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না; কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

সময় যেহেতু পরিবর্তনশীল। সুতরাং পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো সহজ হয়ে বেঁচে থাকা। জীবন আসলে ফুটবল খেলার মতো। ফুটবল একটি সহজ খেলা, কিন্তু একে সহজভাবে খেলাটাই অনেক কঠিন। বেঁচে থাকাটা সহজ; মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাটা অনেক কঠিন।

লালন বলেন, "সহজ মানুষ খুঁজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে।" শেক্সপিয়র বলেন, 'আমি সব সময় নিজেকে সুখী ভাবি; কারণ আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না; কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

মানস রোগের ইতিকথা

ত্রিদেব দেবনাথ অপু
৫৬তম এমবিবিএস

Onimania :

এই রোগের সর্বপ্রধান লক্ষণ হল, রোগী তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রায় পুরোটাই ব্যয় করে সারাদিন শপিং-মার্কেটিং-এর পিছনে সেটা তার দরকারি না-হলেও। যতক্ষণ সে কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে ততক্ষণ সে তার মনের দুঃখ, শোক ভুলে থাকে। যখনই সে দোকান ছেড়ে বাইরে চলে আসে আবার তার মনে সেই অদম্য প্রবৃত্তি জেগে ওঠে তখন সে আবার শপিং করতে ছুটে যায়।

মজার ব্যাপার হলো, একসময় বেশিরভাগ সময় রোগী তার কেনাকাটার জিনিস লুকিয়ে রাখে, বা পুড়িয়ে ফেলে, কারণ সে তার রোগটা বুঝে ফেলে, তা নিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, এটা মেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা দেয়।

Autophegia :

রোগী নিজের শরীরের কোনো অংশ নিজে থেকেই খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, রোগী প্রথমে হাতের নখ কাটতে শুরু করে। কিন্তু কয়েকদিন পরই দেখা যায় যে, সে তার হাতের আঙুলগুলো প্রায় ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে রোগীর সব দাঁত তুলে ফেলতে হয় যাতে সে আর নিজের কোনো ক্ষতি না-করতে পারে।

Exploding Head Syndrome :

যদি হঠাৎ হঠাৎ করে বিনা কারণেই আপনার মাথার ভিতরে বোমা বিস্ফোরণ, কিংবা বন্দুকের গুলির বা গাড়ির টায়ার ফাটার মতো ভয়াবহ কোনো আওয়াজ হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে আপনি Exploding head, Syndrome এর রোগী মজার হলো রোগীর কিন্তু কোনো প্রকার ব্যথা অনুভূত হয় না; কিন্তু মাথার ভিতরে এইরকম বিকট শব্দ হওয়া নিশ্চয়ই কোনো সুখকর বিষয় না। সাধারণত অতিরিক্ত টেনশন বা দুশ্চিন্তা থেকে এ-রকম হতে পারে।

Sleeping Beauty Syndrome :

রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫-২১ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ঘুমাতেই ব্যস্ত থাকে এবং এরকম অবস্থা একবার শুরু হলে টানা ৩ সপ্তাহ পর্যন্তও চলতে পারে। সাধারণত ছেলেদের এটা বেশি হয়।

Stockholm Syndrome :

এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো Victim ধীরে ধীরে অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল কিংবা আসক্ত হয়ে পড়ে; এমনকি কয়েকদিন পর অপরাধীর সাথে অপরাধ-কর্মে নিজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

Kindnapping-এর কেসগুলোতে এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তবে জিম্মি, কিংবা রেপ কেসেও এমনটা দেখা যেতে পারে।

১৯৭৩ সালে Stockholm-এ এক ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা থেকে নাম পাওয়া এই জটিল মানসিক অবস্থা, খুব সম্ভবত schizophrenia'র পর সবচেয়ে বিখ্যাত।

১৯৭৩ সালের ঐ ঘটনায় stockholm-এর এক ব্যাংকে ডাকাতির সময় ব্যাংকের ৪ কর্মচারীকে ৬ দিন আটকে রাখে। পরে যখন তাদের উদ্ধার করা হয়, তখন তাদের কেউই ঐ ব্যাংক ডাকাতদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় না, উল্টে তারা ঐ ডাকাতদের পক্ষে মামলার জন্য ফান্ড কালেকশন শুরু করেছেন!!!

মেয়ে/মহিলাদের মধ্যে এই অবস্থা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

Lima Syndrome :

stockholm এর সম্পূর্ণ উল্টা–

এখানে অপরাধী/ কিডন্যাপার আকর্ষণ জন্মায় victim-এর উপরে।

The walking dead/cotards syndrome :

আপনি মনে করবেন যে, আপনি আসলে মারা গেছেন, কিন্তু তারপরও ঠিকই উঠে ঘোরাঘুরি, হাঁটাহাঁটি করে বেড়াচ্ছেন। অনেক রোগী মনে করেন যে, পৃথিবীর সবাই মারা গেছে। কিন্তু সবাই সাধারণ মানুষের মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক রোগী আবার আত্মহত্যা করে দেখার চেষ্টা করে, সে আসলেই মারা গেছে কিনা।

বাজান ও বাজান

প্রিমা জাহান
৫৬তম এমবিবিএস

বাজান, ও বাজান। ৫ মাস হইলো এগুলো, দেশ হইলো না স্বাধীন। সোহানের বাপের কোনো খবর নাই, তারে মনে কইরা কাটে রূপবতীর প্রতিটা দিন। আস্তে আস্তে নয় মাস পার হইলো, দেশ হইলো স্বাধীন, বাজানরে দেইখা সোহান কয় 'বাজান ও বাজান দেহো মায় শুইয়া আছে মেলা দিন, ঘরেও আইয়ে না কয়দিন ধইরা, মায় রইছে এহানে পইরা।' আমি যখন এত টুককুন ছিলাম তুমি তখন গেছো, নয় মাস যুদ্ধ কইরা এতোদিনে আইছো। ওমা তোমার গায়েও দেহি ভাইয়ের মতো দাগ। ঘরের পিছনে সে যে গেছে এখনো আইয়ে না, কও আমার ওঠে না বুঝি রাগ? একদিন কী হইলো জানো বাজান!!!! চান্দের আলো আর ছন্না পাতা মিশে একাকার, আমরা মায়ের কাছে শুনি গল্প রূপক আর মাঝরাতে আমরা শুইয়া আছিলাম মায়ের বুকে। হঠাৎ কেডা জানি কয় বাহির থাইকা 'সোহানের বাপ ঘরে আছো নাকি'? দরজা মেইলা দেহি চেয়ারম্যান চাচা মিটমিটাইয়া হাসে। বাজানগো, তোমারে না পাইয়া তারা ভাইরে লইয়া যায় টেনে। বাজান! শুধু ভাইরে ক্যান নিলো? আমার কি দোষ আমারে নিলে কি তাগো কম পরতো? ভাই সারাদিন ক্যান ঘুমায় খায়ও না। এর এতো ঘুম দেইখা মায় কান্তে কান্তে ওঠানটা দেয় ভিজায়। ও মা! তার কান্দা শুইন্যা মারে আমার সান্ত্বনা দিতে ঘরে যায় লইয়া। বাজান, ও বাজান, জানো, বাইরে দাঁড়াই আমি শুনি ঘরেও মায়ের চিৎকার, এমনে বুঝি কান্দন লাগে, তুমি কও এতো কান্দনের কী দরকার।"

মেধা বনাম পরিশ্রম ও ধৈর্য

মুহাম্মদ ওমর ফয়সাল
২৬তম বিডিএস

জনসাধারণের মতে মেডিক্যাল সেক্টরে ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা শুধু মেধাবীরাই করে। অবশ্যই মেধাবীরাই ডাক্তারিতে চান্স পায়। কিন্তু সেই মেধাবীদের অনেকেই মেডিক্যালে এসে খেই হারিয়ে ফেলে। প্রতিবছর অনেক ছাত্র-ছাত্রী সাপ্লি খায়, রিসাপ্লি খায়। কেউ আবার ইয়ার-লসও দেয়। অনেকে মাঝপথেই পড়ালেখা ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ ব্যর্থতা আর সহ্য করতে না-পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। ব্যর্থতার তালিকায় ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু দেশের সেরা মেধাবীদের কেন এই অবস্থা?

মেডিক্যালের পড়ালেখার সিস্টেম এর আগে ১২-১৩ বছর ধরে গতানুগতিকভাবে পড়ে আসার সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মেডিক্যাল বিজ্ঞান গতিশীল; এতে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তাই এক্ষেত্রে কৌশলী হতে হয় যথেষ্ট, সেই সাথে পরিশ্রমী এবং ধৈর্যশীলও হতে হয়। এই তিনটি বিষয় ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাগ্য। ভাগ্য না-থাকলে মেডিক্যালে টেকা যেমন সম্ভব না, তেমনি পাশও না। বইয়ের প্রতিটি তথ্য একজন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না। তাই যা দরকারি এবং অবশ্যই জানতে হবে, শুধু তা-ই পড়তে হবে। পড়া মনে না-থাকলেও বারবার পড়লে, লিখলে এবং অন্যজনকে পড়া দিলে তা মনে গেঁথে যায়। ঐ পড়া আর ভোলা সম্ভব না। কিন্তু এই জায়গায় বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ব্যর্থ হয়। তারা ধৈর্য নিয়ে পড়তে পারে না। দু-একবারের ব্যর্থতায় হাল ছেড়ে দেয় তারা। ফলাফলে তারা পিছিয়ে যায় অন্যদের তুলনায়। অনেকে ভালো রেজাল্টকারীদের মেধাবী আখ্যা দেয়। কিন্তু ঐ মেধাবীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন : পরিশ্রম আর ধৈর্য্য ব্যতীত তাদের কাছে মেধা বলতে কিছু নেই। তারা অল্পতেই ভেঙে পড়ে না। পরিশ্রম করে যায়। সবশেষে পরিশ্রমের ফল পায়। তাই মেডিক্যালে আসলে মেধা বলতে কিছু নেই। সব পরিশ্রম ও ধৈর্যের ফল।

প্রায়শ্চিত্ত

সোহেল রানা
২৬ তম বিডিএস

জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে নিশিতা, তাকিয়ে আছে বাইরের রাস্তার দিকে।

বিকেলের রোদ এসে পড়েছে তার মুখে, কিছুটা স্নিগ্ধতা আর অনেকটুকু প্রশান্তি খেলা করছে তার মুখে।

তার ভেতরের অস্থিরতাটা কে পুরোপুরিই ঢেকে দিয়েছে, ঢেকে দিয়েছে তার ভেতর চলতে থাকা যুদ্ধপ্রস্তুতির সকল চিহ্ন।

রুমি, সুমি ঘুমিয়ে আছে। কী নিষ্পাপ দুটি চেহারা। এদের জন্যই তো এত যুদ্ধ, এদের জন্যই এত সংগ্রাম।

মাঝেমাঝে নিশিতার মনে হয়: সে কোনো বিশাল পাপ করেছিল; তাই হয়তো বিধাতা তাকে এই শাস্তি দিচ্ছেন।

নাহলে মা হয়ে কেন সে তার মেয়েদের সাহায্য করতে পারছে না? যার গর্ভে তারা দশমাস কাটিয়ে এসেছে, যার রক্তে বেড়ে উঠেছে আজ তার রক্তই তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়।

নাহ্ পাপতো নিশিতা করেছেই, যখন তার ভার্সিটির প্রিয় বান্ধবীটির রোড এক্সিডেন্ট হলো,

হ্যাঁ, সেই কলেজ-জীবন থেকে তারা একসাথে আছে, নিশিতা আর মিতা।

রক্তের জন্য কী হাহাকার, কিছুতেই মেলে না রক্ত। কী করে মিলবে, মিতার রক্তের গ্রুপ-যে এ-নেগেটিভ। কই নিশিতা তো সেদিন বান্ধবীর জন্য সাহস করে বলতে পারল না তার রক্তের গ্রুপ এ নেগেটিভ। মিতাকে একনজর দেখেই নিশিতা হাসপাতাল থেকে ছুটে পালায়। রক্ত, কত রক্ত! রক্তের যে নিশিতার ভীতি।

সেদিন তো নিশিতা পারেনি তার ভয়কে জয় করে নিজের বন্ধুকে সাহায্য করতে।

শুধুই কী তা-ই, বিয়ের পর থেকে জুয়েলকেও তো সে রক্ত দিতে দেয়নি, কতবার কতজন রক্ত লাগবে বলে যোগাযোগ করেছে প্রতিবার জুয়েলকে না-না অজুহাত দেখাতে হয়েছে নিশিতার জন্য।

নাহ্, এসব ভাবলে চলবে না। তার সন্তানদের জন্য তাকে শক্ত হতে হবে, মাস তো প্রায় শেষ। আবার যুদ্ধে নামতে হবে, তার মেয়েদের জন্য সময়-কেনার যুদ্ধ। তাদের-যে এখনো অনেক কিছু করার বাকি।

সে সব মানুষদের কাছে সাহায্য চাইতে হবে যাদের একসময় নানা অজুহাত দেখিয়ে বিমুখ করেছে সে আর জুয়েল। তার মেয়েদের জন্য এটুকু তাকে করতেই হবে।

জামিল আজকেও ক্লাস মিস করল, সবকিছু ঠিকঠাক প্ল্যান করা ছিল। সকালে সময়ের আগেই বেরিয়েছে, ক্লাসে ঢুকতে যাবে এমন সময় সেই পরিচিত কাগজ। ব্লাড রিকুইজিশন পেপার। "এবি পজেটিভ"। ভেবেছিল পাঁচ মিনিটের কাজই তো; ব্লাড দিয়েই ক্লাসে যাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা গেল পেশেন্ট পক্ষ একেবারেই অজ্ঞ। পুরো ব্যাপাটা বুঝিয়ে দেয়ার পরও চেহারা দেখে মনে হলো না কিছু বুঝেছে। তাই সেম্পল-কালেকশন, ক্রসমেচিং সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিতে হলো।

গত সপ্তাহেও রকিব স্যারের ক্লাসটা মিস হইসে। ফাস্ট ইয়ারে অবশ্য স্যাররা কাউকে চিনে না বলে সুবিধা, ক্লাস মিস দিলেও তেমন একটা ধরতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হলো রকিব স্যার সম্পর্কে জামিলের মামা। হ্যাঁ, আপন মামা।

পরের ক্লাসে গিয়ে শুনে তাকে রকির স্যার তার রুমে ডেকেছে।

তাই জামিল ক্লাস শেষেই রওনা দিল স্যারের রুমের দিকে।

দরজায় গিয়েই জামিল উঁকি মারল এবং ধরা পড়ে গেল।

-আয় ভেতরে আয়।

-ডাকছিলা?

-হুম, তোদের সাথে আমার ক্লাস আছে হাতেগোনা কয়েকটা। প্রথম দুইটাতেই তোর দেখা নাই। আমি কি খুব খারাপ পড়াই, নাকি আমার ক্লাস করবি না বলে ডিসিশন নিসস?

-নাহ্, সে রকম কিছু না। আজকেও ঢুকতে যাব এমন সময় একজন হেল্প চেয়ে বসল। তোমারই ওটি, বোধয় কার্ডিও সার্জারি। পেশেন্ট পক্ষ কিছুই চিনেনা। তাই সময় লেগে গেল।

- ক্লাস বাদ দিয়ে জনসেবা হচ্ছে? এগুলা করার সময় পরেও পাবে।

- এখনই তো সময়, পরে তো তোমার মতো ডাক্তার হয়ে যাব আর বিরক্ত মুখে বলব, "এখন সময় নাই পরে আসেন"।

- নাহ্ তোকে তোর আম্মু ছাড়া আর কেউ সোজা করতে পারবে না। দাঁড়া আপাকে কল দিচ্ছি।

- প্লিজ মামা আম্মুকে না, কথা দিচ্ছি তোমার পরের সবগুলা ক্লাসে থাকব।

- আচ্ছা যা এবারের মতো মাফ, মনে থাকে যেন।

- আচ্ছা মামা যাই, ক্লাস আছে।

একথা বলেই জামিল দৌড় দিলো, ডা. রকিব আপন মনে হেসে উঠলেন। আসলেই মানুষকে সাহায্য করার একটা বয়স থাকে। একটা সময় পর আর সহানুভূতির ব্যাপারটা আর আসে না। সবকিছুর মাঝে একটা যান্ত্রিকতা চলে আসে। নিজের স্বার্থটা খুব বেশি ভাবায়। এমনকি আশেপাশের এমন স্বার্থহীন মানুষগুলোকেও বিরক্তিকর মনে হয়, বোকা মনে হয়। আজ জামিলের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো বাকি ক্লাসগুলোতে ঢুকতেই দিতেন না। আমরা এমন কেন হয়ে যাই?

সকাল থেকেই নিশিতার মনে অস্থিরতা কাজ করছে। হ্যাঁ আজকেই সেই যুদ্ধের দিন। রাতে জুয়েলের বন্ধু রহিম ভাই কল করে জানিয়ে দিয়েছে, এবার ব্লাড দিতে পারবেনা, পরের দিন জার্নি করতে হবে, ঢাকা যাবেন তিনি।

নিশিতার ইচ্ছে হলো একবার বলে রক্ত দিলে জার্নিতে এমন কী সমস্যা হবে আর ঢাকা-চট্টগ্রাম তো এমন কোনো দূরত্বও না। কিন্তু বলতে পারল না। এর চেয়ে কত সামান্য কারণ দেখিয়ে 'না' করেছে জুয়েল, ওর জন্যই করতে হয়েছে। আর উনি তো আগেও কয়েকবার দিয়েছেন।

পরিচিতদের মাঝে এমন কেউ নাই-যে কল দিবেন। এবি-পজেটিভ ব্লাডটা এত রেয়ার জানা ছিল না নিশিতার।

জুয়েলের নাকি অফিসে জরুরি কাজ আছে। তাই আজকের যুদ্ধটা নিশিতাকে একাই সামাল দিতে হবে।আগে কখনো একা করেনি, তেমন কিছুই জানে না সে। তারপরও সকালবেলা দুই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মেডিক্যালের উদ্দেশ্যে। রাহুলের ন'টার মাঝেই চলে আসার কথা। রাহুল নিশিতার ছোটভাই। তারও আজকে রক্ত দেয়ার কথা। মেডিকেলের গেটেই দেখা হলো রাহুলের সাথে।

রাহুলকে দুই ভাগিনার সাথে ওয়ার্ডে বসিয়ে রেখে নিশিতা বেরুল রক্তের সন্ধানে। তার দৌড় ব্লাড ব্যাঙ্ক পর্যন্তই। সেখানে যখন পেলনা তখন কী করতে হবে কিছুই জানে না নিশিতা। তাই একপাশে দাঁড়িয়ে রইল আর নিজে অসহায়ত্বের চাপে পিষ্ট হতে লাগল।

জামিল সময় পেলেই হাসপাতালের ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায়, নানান রকম মানুষের সাথে কথা হয়, পরিচয় হয়, ভালই লাগে। এত এত অসুখবিসুখের মাঝে বিধাতা তাকে সুস্থ রেখেছেন, ভাবলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়।

আজকেও সে তেমনই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ নিশিতাকে দেখে কী মনে করে দাঁড়িয়ে গেল।

- আপু এখানে দাড়িয়ে আছেন, কিছু খুঁজছিলেন?

- নাহ্, ব্লাডের জন্য আসছিলাম। বল্ল, নাই। তাই কী করব বুঝতে পারছিনা।

- ব্লাড গ্রুপ জানেন? পেশেন্ট কোন্ ওয়ার্ডে? চলেন দেখে আসি।

- ব্লাড গ্রুপ এবি-পজেটিভ। এই যে কাগজ।

- আমারো এবি-পজেটিভ। তবে আপু কয়েকদিন আগে দিয়ে দিছি ব্লাড। তবে সমস্যা নাই, আমি চেষ্টা করতেছি।

কী ফুটফুটে দুটা বাচ্চা, তাদের মামা ঘুমপাড়ানোর চেষ্টা করছে। কে বলবে ওরা এমন একটা রোগে আক্রান্ত।

এর মধ্যে জামিল তার তিনজন ক্লাসমেটকে কল দিয়েছে। সবাই বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে 'না' করেছে। এখন শুধু একটাই উপায় আছে।

যদিও কয়েক মাস হলো কলেজে এসেছে; এখনো সন্ধানী তে যাওয়া হয়নি। সিনিয়র-ভীতি জামিলের বরাবরই প্রবল। সন্ধানীর নাম শুনলেই মনে হয় কিছু গোমড়ামুখো সিনিয়র একটু পরপর নানা বিষয় নিয়ে ধমকাবেন। যদিও ব্যাপারটা হাস্যকর, সে রীতিমত একজন ভার্সিটি-পড়ুয়া ছেলে, তারপরও ভয় তো সবসময়ই অযৌক্তিক।

সন্ধানীতে গিয়ে রীতিমতো অবাক, এত মানুষের সাহায্য দরকার? ঋতুকে দেখল খুব ব্যস্ত। এর-ওর সাথে কথা বলছে, রোগীপক্ষকে বুঝাচ্ছে। অথচ ক্লাসে এই মেয়েকে কখনো কথা বলতেই দেখেনি। জামিলকে দেখেই ঋতু এগিয়ে এল। নিশিতার সাথে কথাবলেই লেগে গেল ডোনার ম্যানেজ করতে।

নিশিতা অবাক হয়ে দেখছে, মেয়েটা একের পর এক কল করে যাচ্ছে, এত আন্তরিকভাবে কথা বলছে যেন প্রয়োজনটা তার। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা কল দিলো। তারপরও একটুও বিরক্ত ভাব দেখাচ্ছে না।

কাউকে বোধ হয় পাওয়া গেছে। টেলিফোন রেখে মেয়েটা তার দিকেই আসছে।

- আপু একজনকে পাওয়া গেছে ও আধাঘণ্টার মাঝে আসতেছে। আপানাদের কি কেউ আছে পরিবর্তে যে-কোনো গ্রুপের রক্ত দিতে পারবে?

- আমার এ-নেগেটিভ। আমি দিলে হবে?

- হ্যাঁ আপু শারীরিক কোনো সমস্যা না-থাকলে অবশ্যই পারবেন। আর ওই যে দেখছেন ওই বাবুটা ওরও থ্যালাসেমিয়া। ওর রক্তের গ্রুপ এ-নেগেটিভ, সকাল থেকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি।

নিশিতা দেখল তার মেয়ের বয়সেরই একটা ছেলে। এত দিন ধরে রক্ত না-দেয়াটাকে অপরাধ মনে হলো।

জামিল দেখল নওশাত আসছে, জামিলকে দেখেই কৈফিয়তের মতো করে বল্ল,

- আসলে, আপু এমনভাবে বল্লনা।

- আপু, না? ঋতু কল দিসিল তোকে।

- কী! ঋতু! মানে আমাদের ঋতু? ও কথা বলতে পারে?

- পারে বন্ধু পারে। মানুষের উপকার করার মাঝে একটা নেশা আছে, এখানে সবাই নেশাগ্রস্ত মানুষ। এরা সবই পারে।

- তোরও তো মতিগতি ভালো ঠেকতেছে না, আর শরীরে আসলে তখন কেন জানি ইচ্ছা করতেছিল না।

- আরে না-না ঠিক আছে, বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। এখন চল্ আরও কিছু কাজ আছে।

রাত প্রায় বারোটা, নিশিতা তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত নগরীর দিকে। রুমি, সুমি আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে গেছে। আজকের দিনটাতে তাদের উপর কম ধকল যায়নি। আজকে নিশিতা সত্যিই খুশি, তার রক্ত তার মেয়েদের প্রয়োজনে না-আসলেও সে জানে এই শহরে কোনো এক মায়ের নিশ্চিন্ত ঘুমের কারণ সে। মেডিক্যালে পরিচিত হওয়া ছেলেটা পুরোটা সময় তার সাথে ছিল। সব ব্যবস্থা সে আর তার বন্ধুটাই করেছে। আশ্চর্য ছেলে দু'টার নামটাই তো জানা হয়নি, সেই মেয়েটার নামও তো জানা হলোনা।

নিশিতা বোধহয় মহান করুণাময়ের পরিকল্পনাটা একটু-একটু বুঝতে পারছে। ঘুমন্ত রুমি-সুমির দিকে তাকিয়ে মনে হলো, না এরা তার শাস্তি নয়। এরা তার জন্য আশীর্বাদ, এদের জন্যই সৃষ্টিকর্তার কিছু অসাধারণ সৃষ্টির কাছাকাছি যেতে পারছে।

আর তার শাস্তি হলো এদের এত কাছাকাছি থেকেও, তাদের কাছ থেকে এতটা সাহায্য নিয়েও সৃষ্টিকর্তা কখনো এদেরকে সামান্য ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগটা দিবেন না। বুঝে উঠার আগেই এরা হারিয়ে যাবে তাকে ঋণী করে।

আত্মার ওপারে

তাসমিন আক্তার শোভা
২৬তম বিডিএস

রোহানের আজ বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাসার কাছাকাছি আসতেই বাবার ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। বাবাকে ভীষণ ভয় পায় সে। অগোচরে হিটলার বলেও ডাকে। খুবই রাগী মানুষ। দয়া-মায়ার ছিটে-ফোঁটাও নেই তার মাঝে। লোকটা কি আসলেই মাটির তৈরি, নাকি পাথরের তৈরি, এ বিষয়ে রোহানের সন্দেহ আছে।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই রোহান দেখতে পেল ভেতরে অনেক পরিচিত-অপরিচিত মানুষ। কান্না-কাটি আর বিলাপের সুর ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটু কাছে গিয়েই দেখলো, একটা লাশকে ঘিরে সবাই কান্নাকাটি করছে। রোহানের মা এর মধ্যে মূর্ছা গেছেন কয়েকবার। বাবাকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে।

"এত বেলা পর্যন্ত মানুষ ঘুমায় নাকি? ক্লাস নাই? পরীক্ষা নাই? অকর্মা ছেলে! কিচ্ছু হবে না তোকে দিয়ে..." বাবা অনর্গল বকেই যাচ্ছেন রোহানকে।

কার লাশ এটা? ভয়ে ভয়ে কাফনের কাপড়টা উঠালো রোহান। চমকে উঠলো সে! কাফনে মোড়ানো মানুষ আর কেউ নয়। রোহান নিজেই! কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? কাফনে তার লাশ কোথা থেকে এলো? রোহান সবার সামনে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে সে জীবিত। তার জন্য কান্নাকাটি করার কিছু নেই। একটু পরে রোহান নিজেই বুঝতে পারে কেউ তাকে দেখছে না। তার কথা শুনতে পাচ্ছে না, এর মানে কি সত্যিই তার মৃত্যু হয়েছে?

একটু পর রোহান তার হিটলার বাবাকে দেখলো। ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছেন। একটু পর আবার যাচ্ছেন। বাবা ওয়াশরুমের ভেতরে কী করছেন রোহান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পানির সবগুলো নল ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদছেন; যাতে বাইরে কান্নার শব্দ না-যায়। উনি সবসময় কঠিন ভাব দেখাতে পছন্দ করেন। আজও চেষ্টা করছেন কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছেন। এ-মানুষটা ভেতরে ভেতরে এত নরম মনের তা কখনোই বুঝতে পারেনি রোহান।

রোহান এখন তার প্রেমিকার বাসায়; যে এক সপ্তাহ আগে সাবেক হয়ে গিয়েছিল। এই সাবেক প্রেমিকার জন্য গতরাতে রোহান সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল। কিছুক্ষণ আগে মেয়েটা রোহানের মৃত্যুর খবর শুনেছে। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করলো। ফেসবুকে খুবই হৃদয়বিদারক স্ট্যাটাসও দিয়ে ফেলেছে। সেই স্ট্যাটাসের কমেন্টে শোকসভায় যোগ দিলো রোহানের বেস্ট ফ্রেন্ড। এসব দেখে রোহানের চোখে আবেগে পানি চলে এলো। সেই পানি বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। যখন দেখলো তার প্রেমিকা আর তার বেস্ট ফ্রেন্ড মোবাইলে অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছে। তাদের প্রথম দিকের আলোচনা ছিল রোহান-সম্পর্কিত। ক্রমেই তারা ব্যক্তিগত কথা বলতে শুরু করে। কথোপকথনের ক্ষণে-ক্ষণে রোহানের প্রেমিকা এমনভাবে খিলখিলিয়ে হাসছে যে, কিছুক্ষণ আগে এই মেয়েটাই রোহানের শোকে কাতর হয়ে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলেছে, এটা বিশ্বাস করতে রোহানেরই কষ্ট হচ্ছে!

মৃত্যুর পর চারপাশের সম্পর্কগুলো ধীরে-ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে রোহানের কাছে। কিন্তু আফসোস, এখন কিছুই করার নাই। মা-বাবার জন্য খুবই কষ্ট লাগতে লাগলো। বেঁচে থাকতে কোনোদিন তাদের গলা জড়িয়ে ভালোবাসি বলা হয়নি। কিন্তু রোহানকে কতইনা ভালোবাসতেন তারা। ইস্! সৃষ্টিকর্তা যদি তাকে আরেকবার জীবন দান করতেন!

পরিচিত গলার চিৎকারে চোখ খুলে তাকালো রোহান। তার বাবা চিৎকার করছেন চিরচেনা হিটলার-রূপে। "এত বেলা পর্যন্ত মানুষ ঘুমায় নাকি? ক্লাস নাই? পরীক্ষা নাই? অকর্মা ছেলে! কিচ্ছু হবে না তোকে দিয়ে..." বাবা অনর্গল বকেই যাচ্ছেন রোহানকে।

রোহানের মুখে সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। বাবার বকাগুলো আজ খুবই মধুর লাগছে। বিছানা থেকে উঠেই জীবনে এই প্রথমবার তার হিটলার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমাকে অনেক ভালোবাসি বাবা!"

HEMOCHROMATOSIS : Let Me Bleed!

Nazmus Sakib Sarker
58th MBBS

We see people around us donating blood because it makes them feel good emotionally to do something altruistic. Is that all? No, there are some people who need a good bleeding to make their aches and pains go away, they are suffering from hemochromatosis.

Hemochromatosis is a hereditary disease that disrupts the way the body metabolizes iron. Normally, when our body detects that it has sufficient iron in the blood, it reduces the intestinal absorption of iron. In a person with hemochromatosis, the body always thinks that it doesn't have enough iron and continues to absorb iron more & more. This iron overloading has deadly consequences over time. The excess iron is deposited throughtout the body, ultimately demaging the joints, the major organs and overall body chemistry. Unchecked, hemochromatosis can lead to liver failure, heart failure, diabetes, arthritis, infertility, psychiatric disorders and even death.

> No, there are some people who need a good bleeding to make their aches and pains go away, they are suffering from hemochromatosis.

For more than 125 years, after Armand Trousseall first described it in 1865, hemochromatosis was thought to be extremely rare. Then in 1996, the primary gene that causes the condition was isolated for the first time. It is the most common genetic variant in people of Western European descent. One in two hundred people of Western European ancestry actually have the desease with all of it's assorted symptoms.

People who have hemochromatosis have a form of iron lacking going on as a permanent condition. Plenty of iron is present normally in a non-hemochromatic person; which helps the infectious agents contained within it grow faster and gets excess though the lymphatic system. But that thing doesn't occur in a hemochromatic person. Macrophages not only isolate infectious agents and cordon them off from the rest of the body, they also starve those agents to death.

Hemochromatosis is caused by genetic mutation. It infectious the plague, of course. Recent research has suggested that it originated with the vikings and was spread throughout the Northern Europe. It may have originally evolved as a mechanism to minimize iron deficiencies in poorly nourished people living in harsh environment. As the Vikings settled the European coast, the mutation may have grown in frequency through "Founder Effect".

ARAN GORDON, first menifested symtomps of hemochromatosis as he began training for the Marathondes Sables– that grulling 150 mile race across the Sahara Desert. This mutational disorder may very well have helped his ancestors to survive the plague. His health was restored by Bloodletting, one of the oldest medical practices.

Bloodletting has a longer or more complicated record in history. First recorded three thousand

years ago, in Egypt. Syrian doctors used leeches for it. Doctors and shamans from Asia to Europe to America used sharpened sticks, Shark's teeth, miniature bows and arrows to bleed their patients. In western medicine, the practice was derived from the thinking of greek physicion Galen, who practiced the theory of four humars– Blood, Black bile, Yellow bile and Phlegm. According to Galen and his intellectual decendants, an illness resulted from an imbalance of the fair humours and the doctors job is to treat it through fasting, purging and bloodletting.

In the eighteenth and nineteenth Century, this practice reached its peak. According to medical tests of the time, if you presented to your doctor with fever, cough, dizziness, headache, palsy, you would be bled. As crazy as it sounds, even if you are hemorrhagic, you would be bled.

Now, it is absalutely clear that the bloodletting is a treatment of choice for hemochromatosis patients. Regular bleeding of such patients reduces the iron in their systems to normal levels and prevents the iron buildup in the organs, which is so damaging. A Canadian physiologist named Norman Kasting discovered that bleeding animals, induces the release of vasopessin, which reduces the risk of fever and infection. The connection is not unequivocally proven in humans.

One thing is clear that an ancient medical practice that 'modern' medical science dismissed out of hand is the only effective treatment for a disease that would otherwise destroy the lives of thousands of people.

প্রত্যাশা

মারিয়া ফাতিমা
২৭তম বিডিএস

২৭ মার্চ, ১৯৭১। অন্যদিনের মতো স্বভাবসুলভভাবেই দেরি করে বাড়ি ফিরেছিলো অরুণ। তবে বাড়ির পরিবেশটা অন্যদিনের মতো ছিলো না। বাবা মায়ের মুখে শুনেছিলো তার অন্তঃসত্ত্বা প্রিয়তমা স্ত্রীর সম্ভ্রমহানির গল্প।

আত্মহত্যা করতে গিয়েও বেঁচে যায় মেয়েটা। তারপর আর চুপ করে থাকতে পারে নি অরুণ। যে-ছেলেটা কোনোদিন একটা পিঁপড়াও পায়ে মাড়ায়নি সে হাতে নেয় অস্ত্র, স্ত্রীর সম্ভ্রমের মূল্য চুকাতে। বর্ডার পেরিয়ে ট্রেনিং নেয় ভারতে। এর পর শুরু হয় অরুণের গেরিলাজীবন। মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে আসতো প্রিয়তমা কল্যাণীর সাথে দেখা করতে। ক্ষণিকের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রটাকে ভুলে যেতো। কল্যাণীর গর্ভে বেড়ে উঠা নতুন প্রাণটাকে নিয়ে আদিখ্যেতার শেষ নেই অরুণের।

সেবার যখন এসেছিলো অনাগত অতিথি তখন প্রায় দরজায় কড়া নাড়ছে। অরুণ বলেছিলো, পতাকা নিয়ে বিজয় মিছিল করে আসবো নতুন অতিথি বরণ করতে।

সেদিন বিজয় মিছিল হয়েছিলো, স্বাধীন দেশের আকাশে উড়েছিলো লালসবুজের হাজারো পতাকা। বিজয়োল্লাসে ম্লান হয়ে গিয়েছিলো কল্যাণীর প্রসবযন্ত্রণার চিৎকার, নতুন অতিথি এসেছিলো, শুধু আসেনি অরুণ; যার পতাকা হাতে আসবার কথা ছিলো নতুন অতিথিকে বরণ করবার। হাজারো মানুষ পতাকা হাতে এসেছিলো ছোট্ট অপরাজিতাকে বরণ করতে। দেখতে দেখতে ৪৬ বছর পেরিয়ে গেছে। আজ ৪৬তম জন্মদিন অপরাজিতার। মা ডাকে বিজয়া।

লাউড স্পিকারে দূরে বাজছে : 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'। বিজয়া ভাবছে বাবার কথা। যে ফুলটা বাঁচাবে বলে তার বাবার মতো অসংখ্য বাবারা ঘুমিয়ে গেছে চিরতরে সে ফুলটা কি সত্যিই বাঁচাতে পেরেছে!

আজো কল্যাণীরা সম্ভ্রম হারায় পশুদের হাতে। এইরকম কিছু কি চেয়েছিলো অরুণরা ! চোখ দুটো উষ্ণ হয়ে উঠে বিজয়ার। নিজের অজান্তেই দু' ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে যায়।

হঠাৎ চমক ভাঙলো মায়ের গানে। পাশের ঘরে মা গাইছেন : "সব কটা জানালা খুলে দাও না, ওরা আসবে চুপি চুপি"

বিজয়া মুচকি হেসে চোখ মুছলো। অরুণদের আসতেই হবে। যে-ফুলটাকে বাঁচাতে চেয়েছিলো তাকে-যে বাঁচাতেই হবে। হারাতে দেয়া যাবে না কোনোভাবেই।

ব্লাড ডোনেশান

সামি মো. নিজাম
২৭ তম বিডিএস

প্রত্যেক রক্তদাতাই একজন বীর'। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে আছে, 'একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানব জাতির জীবন বাঁচানোর মতো মহান কাজ।' ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে : 'নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব।' (ঋগবেদঃ ১/১২৫/৬)।

এখন প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে প্রায় তিন কোটি ২০ লাখ লোক রক্তদান করে থাকে। কিন্তু রক্তের প্রয়োজন আরো বেশি। কেউ যখন স্বেচ্ছায় নিজ রক্ত অন্য কারো স্বার্থে দান করে তখন তাকে রক্তদান বলে। এ-কারণে রক্তদাতার অবশ্যই সম্মতির প্রয়োজন। কিন্তু অনেকেই রক্ত দিতে ভয় ও দ্বিধায় ভোগেন।

কাউকে রক্ত দানের কথা বললেই বেশিরভাগ মানুষই সর্বপ্রথম যে-দ্বিধায় ভোগেন তা হচ্ছে, আমি যদি এখন রক্ত দেই তা হলে পরে যদি আমার আত্মীয়দের হঠাৎ রক্তের প্রয়োজন হয় তা হলে কই পাবো?

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৬০ লক্ষ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন পড়ে। যার মধ্যে ২৪% আসে স্বেচ্ছা রক্তদানকারীদের কাছে থেকে। নিকটাত্মীয়কে রক্তদান করে ৬২%, আর বাকিটা আসে পেশাদার ডোনারদের কাছ থেকে।

রক্তদাতার বৈশিষ্ট্য :

১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি সুস্থ-সবল মানুষ রক্ত দিতে পারবে।

স্বেচ্ছায় রক্তদানে একজন দাতার কাছ থেকে ৩৮০ থেকে ৪০০ মিলিলিটার রক্ত সংগ্রহ করা হয়; যা তার শরীরে থাকা মোট রক্তের ১০ ভাগের ১ ভাগ এবং উদ্বৃত্ত রক্তের অর্ধেক বা তারও কম। এ-কারণে অধিকাংশ রক্তদাতা রক্তদানের পর তেমন কিছুই অনুভব করেন না এবং এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে-পরিমাণ রক্তের তরল অংশ নেয়া হয় সেই পরিমাণ তরল অংশ মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আবার আগের মতো হয়ে যায়।

৩ মাস পর পর আপনি রক্ত দান করতে পারেন। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী, একজন সুস্থ পুরুষ ৩ মাস ও নারী ৪ মাস অন্তর রক্তদান করতে পারবেন।

৫ থেকে ৭ মিনিট, সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট সময় লাগে রক্ত নিতে।

রক্তদাতার দেহের ওজন সর্বনিম্ন মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪৭ কেজি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫০ কেজি বা এর বেশি হতে হবে। তবে প্লাটিল্যাট লাগলে ওজন কমপক্ষে ৫৫ কেজি হতে হবে, ছেলে/মেয়ে ।

রক্ত দেবার আগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অ্যালকোহল পান করলে রক্ত দান করা যাবে না। পান করার ২৪ ঘণ্টা পর রক্ত দিতে পারেন।

ধূমপায়ী ব্যাক্তি নিঃসংকোচে রক্তদান করতে পারবেন।

অ্যান্টিবায়োটিক খাবার অন্তত ৭ দিন পর এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তারপর রক্ত দান করা যাবে।

যদি আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে আপনি রক্ত দান করতে পারেন।

ঠান্ডা বা সর্দি-লাগা অবস্থায় যেহেতু একটি জীবাণু সংক্রমন থাকে সেহেতু রক্ত দান করা যাবে না।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পিল খাবার সময় রক্ত দান করা যাবে।

যে-সমস্ত ডায়াবেটিক রোগী ইনসুলিন গ্রহণ করেন তাদের রক্ত দান না-করাই ভালো।

ভ্যাকসিন নেবার অন্তত ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত রক্ত দান করা যাবে না। তবে এটা ভ্যাকসিনের ধরনের উপর নির্ভরশীল।

রক্ত দানের পর পর্যাপ্ত তরল পান করুন অন্তত ৪ গ্লাস (স্যালাইন, ফলের রস)। ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ভারী কাজ করবেন না। মাথা ঘুরলে শুয়ে পড়ুন এবং (পায়ের নীচে একটি বালিশ দিয়ে) পা মাথার চেয়ে উঁচুতে রাখুন। দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন। ধূমপান করবেন না ৫ ঘণ্টা।

যারা রক্ত দিতে পারবে না :

যেসব রোগ থাকলে রক্তদাতাকে সারা জীবন রক্ত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে :

অন্তঃসত্ত্বা নারী, ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ, বাতজ্বর, উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপ, রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা, কম ওজনের ব্যক্তি, ডায়াবেটিস রোগী, হেপাটাইটিস বি এবং সি, ক্রনিক নেফ্রাইটিসে আক্রান্ত, এইডস সংক্রমিত, যকৃতের রোগী, নালিহীন গ্রন্থি আক্রান্ত রোগী, সিজোফ্রেনিয়া, সিফিলিস, কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগীরা, সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক নিলে, লেপ্রসি, মৃগী রোগী, হাঁপানি, পলিসাইথেমিয়া ভেরা প্রভৃতি রোগের ব্যক্তি।

যারা সাময়িকভাবে রক্ত দিতে পারবে না:

গর্ভপাত হলে- ছয় মাসের জন্য, বুকের দুধ খাওয়ানো মা ১৫ মাসের জন্য, মেয়েদের মেয়েলি সমস্যা চলাকালীন সময়, ডায়রিয়ায় ৩ সপ্তাহ পর, বসন্তের ক্ষেত্রে সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর, যক্ষ্মার ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় ওষধ সেবনের ২ বছর পর,

চর্মরোগ জনিত সমস্যায় রক্তনালী আক্রান্ত না হলে সে রক্ত দিতে পারেব, রক্ত গ্রহণকারী ছয় মাসের জন্য, ১ বছরের মধ্যে সার্জারি হওয়া, ট্যাটুমার্কধারী- ছয় মাসের জন্য, চিকিৎসা সম্পন্ন ম্যালেরিয়া রোগী- তিন মাসের জন্য (এনডেমিক এরিয়ায়), টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগী- ১ বছরের জন্য (রোগমুক্তির পর), হেপাটাইটিস এ, ই সুস্থ হওয়ার ৬ মাস পর, বিভিন্ন টিকা গ্রহণকারী- ৩০ দিনের জন্য, রেবিস ভ্যাকসিন- ১ বছরের জন্য (টিকা নেয়ার পর), হেপাটাইটিস ইমিউনগোবিউলিন-১ বছরের জন্য।

কোন্ রোগীর জন্যে রক্ত লাগে :

১. সিজারের জন্য
২. রক্ত-স্বল্পতা/অ্যানিমিয়া রোগী
৩. থ্যালাসিমিয়া রোগী
৪. ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য
৫. বাইপাস সার্জারির রোগী
৬. কিডনি ডায়ালসিসের রোগী
৭. ব্লাড ক্যান্সারের রোগী
৮. লিভারের রোগী
৯. এক্সিডেন্টের রোগী
১০. রক্ত বমি রোগে
১১. ডেংগু জ্বরের রোগী

রক্তদানের সুবিধা:

কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন: রক্ত দানের সময় হেপাটাইটিস বি, সি, সিফিলিস, ম্যালেরিয়া এবং এইডস এই ৫টি রোগের স্ক্রিনিং রিপোর্ট পাওয়া যায় বিনামূল্যে, যা তাকে আশ্বস্ত করে তার সুস্থতা সম্পর্কে, যেটা সাধারণ মানের কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকা খরচ হবে।

রক্তে যদি লৌহের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে কোলেস্টেরলের অক্সিডেশনের পরিমাণ বেড়ে যায় ও ধমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত রক্ত দিলে দেহে এই লৌহের পরিমাণ কমে; যা হৃদরোগের ঝুঁকিকেও কমিয়ে দেয় কার্যকরীভাবে।

মিলার-কিস্টোন ব্লাডসেন্টারের এক গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত রক্ত দিলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। ডায়বেটিসের ঝুঁকি কমায়।

প্রতি ৪ মাস অন্তর রক্ত দিলে দেহে নতুন Blood Cell তৈরির প্রণোদনা সৃষ্টি হয়। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

রক্তদান করার সাথে-সাথে আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত অস্থিমজ্জা (Bone Marrow) নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয়। শরীরের সার্বিক সুস্থতা, প্রাণবন্ততা আর কর্মক্ষমতাকেই বাড়িয়ে দেয়।

মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে আপনি পাবেন মানসিক তৃপ্তি।

কোনো সেন্টারে একবার রক্তদান করলে ওই সেন্টার দাতার প্রয়োজনে যেকোনো সময় রক্ত সরবরাহ করে থাকে।

রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ বাড়ে।

আজ যদি আপনি একজনকে রক্তদান করেন, ইনশাহ্‌আল্লাহ্ আপনার পরিচিতদের প্রয়োজনেও আরেকজন এগিয়ে আসবে। রক্ত দান করে তার সাথে সুসম্পর্ক রাখুন, মানুষকে রক্ত দানে উৎসাহিত করুন, ইনশাহ্‌আল্লাহ্ রক্তের অভাবে প্রাণ হারাবে না কেউ।

আচ্ছা,আপনাকে একটি প্রশ্ন করি?

অধিকাংশ মানুষ কেন মনে করে B+ve গরুর রক্ত, তা আমার তা না-দিলেও চলবে, আসলে কি তাই?

পৃথিবীতে যত মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে তাদের সকলেরই রক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে রাসায়নিক গঠনের পার্থক্য থাকায় কোনো প্রাণীর রক্ত অন্য কোনো প্রাণীরই অনুরূপ নয়।

প্রথমেই আসা যাক রক্তের গ্রুপ কী? রক্তের গ্রুপ হলো রক্তের লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যা বংশগতভাবে নির্দিষ্ট। এই অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।

মানুষের ক্ষেত্রে ABO সিস্টেম ও Rh সিস্টেম বিশ্বজুড়ে প্রচলিত। এই দুই সিস্টেম অনুযায়ী A, B, O ও AB এই চার ধরনের রক্তের গ্রুপের প্রতিটির (+) ও (-) অ্যান্টিজেন আছে। এই মোট ৮ ধরনের রক্ত মানুষের শরীরে পাওয়া যায়।

গরুর বেলায় A, B, C, F, J, I, M, R, S, T ও Z এই ১১ টি প্রধান রক্তের গ্রুপ পাওয়া যায়। এর মধ্যে শুধুমাত্র B গ্রুপেরই ৬০ টির উপরে অ্যান্টিজেন আছে। এ ছাড়াও আরও কিছু অপ্রধান গ্রুপের রক্তে আছে যেগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না। এজন্য গরুর রক্ত মানুষ তো দূরের কথা; এক গরু থেকে অন্য গরুতেই সঞ্চালন করা দুরূহ ব্যাপার।

এখন বলছি কেন B+ve কে গরুর রক্ত বলা হয়?

আমাদের এশিয়া মহাদেশে B+ve গ্রুপধারী মানুষের সংখ্যা অন্য যে কোন গ্রুপধারীর চেয়ে বেশি। ফলে কাউকে যদি রক্তের গ্রুপ জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে উত্তর B+ve হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এজন্য হয়তোবা B+ve কে গরুর রক্ত বলা হয়। তবে এশিয়ায় B+ve ধারীর সংখ্যা প্রায় ৩০% হলেও ইউরোপ বা আমেরিকায় তা মাত্র ১০%। তাই আমাদের দেশে B+ve রক্তধারী মানুষ যেমন বেশি, এর রোগীসংখ্যাও বেশি। তাই B+ve রক্তের প্রয়োজনকে অবহেলা না-করে সমান গুরুত্ব দিয়ে রক্ত দানে এগিয়ে আসুন।

ভীষণ ডিপ্রেসডদের জন্য তিনটি গল্প

মালিহা মেহজাবীন
২৮তম বিডিএস

১.

২৪ বছরের যুবক ট্রেনের জানালার পাশে বসে আছে। সমস্যা হচ্ছে সে আচরণ করছে শিশুর মতো। যা দেখছে তাতেই মুগ্ধ হচ্ছে। যা দেখছে সব কিছু নিয়ে তার কৌতূহল!

সে তার বাবাকে বলছে : "দেখো দেখো বাবা, গাছগুলো সব পেছনে চলে যাচ্ছে।" তার বাবা কিছু না-বলে শুধু একটু হাসলো। অন্য পাশের এক দম্পতি করুণ চোখে ২৪ বছর বয়স্ক যুবকের কথা শুনছে।

যুবক আবারও বললো, "দেখো আব্বা, মেঘগুলো আমাদের সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে... ওরা কোন্ স্টেশনে থামবে?" তার বাবা শুধু একটু হাসলেন। কিছু বলছেন না।

সেই দম্পতি যুবকের কথা শুনে বিব্রত হয়ে তার বাবাকে বললো, 'আচ্ছা, আপনি ওকে ভালো কোনো ডাক্তার দেখান না কেন? এত বয়সে এসে এখনো বাচ্চাদের মতো আচরণ করছে।"

তার বাবা হেসে উত্তর দিলেন, "ডাক্তার দেখিয়েছি। আসলে আমরা এখন হাসপাতাল থেকেই বাসায় ফিরছি। আমার ছেলেটা জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলো। আজই প্রথম সে পৃথিবী দেখার সুযোগ পেলো..।

প্রতিটা মানুষের আচরণ ও জীবনের পেছনে একটা গল্প থাকে। গল্পটা হতে পারে আনন্দের, হতে পারে কষ্টের। আমরা সেই গল্প না শুনে মানুষকে ভুল বুঝি, নিজের মতো করে উল্টাপাল্টা গল্প বানাই তাদের সম্পর্কে। তাদের জীবনটা হয়তো কল্পনার চেয়েও কঠিন। তাই কাউকে বিদ্রুপ না-করে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

২.

একটা বিশাল হাতিকে ভীষণ ছোটো একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কোনো খাঁচা নেই, লোহার শিকলও নেই। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এই ব্যাপারটা খেয়াল করে খুব অবাক হলো এক ছেলে। তার চিন্তা হলো, চাইলেই তো হাতিটা এই দড়ি এক নিমেষে খুলে ফেলতে পারে। তারপর ছুটে পালাতে পারে। এটা তার জন্য কোনো ব্যাপারই না। ছেলেটা হাতির ট্রেইনারকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, ঘটনা কী! তারা দড়ি ছিঁড়ে পালায় না কেন?

ট্রেইনার বললেন, 'এরা যখন ছোট ছিল, তখন এমন দড়িতেই বেঁধে রাখা হতো হাতিগুলিকে। তখন হাতিগুলির জন্য এই রকম দড়িই উপযুক্ত ছিল, ছোট থাকা অবস্থায় এই দড়ি ছিঁড়ে বের হতে পারেনি বলে হাতিদের ধারণা হয়ে যায়, এটা আর কখনো ছেঁড়া যাবে না, তাই এখনো এ-দড়িকে তারা সেই আগের মতো শক্ত ভেবে ছেঁড়ার চেষ্টাই করে না।

হাতির মতো আমরাও জীবনের কোনো পর্যায়ে যখন ব্যর্থ হই তখন আর চেষ্টা করি না। আমাদের ধারণা হয়ে যায় : আমরা ব্যর্থতার জাল ছিঁড়তে পারব না। আর এই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে চেষ্টা করাই বন্ধ করে দেই। নিজের যোগ্যতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি। অথচ সামান্য চেষ্টাই সকল ভয়-বাধাকে অতিক্রম করতে পারে। তাই যেখানে সবাই থেমে যাবে, সেখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে।

থেমে যাওয়া মানেই হেরে যাওয়া।

৩.

ছোট ছেলেটার বয়স ১০ কী ১২। কে জানে কোনো রেললাইনের পাশের বস্তিতে অথবা ফুটপাতের পাশে থাকে। সে এক রেস্টুরেন্টে গেল আইসক্রিম খেতে। তাকে দেখে রীতিমতো বিরক্ত রেস্টুরেন্টের ওয়েট্রেস। কারণ একটু পর দোকান বন্ধ করবেন। যদিও মুখে কিছু বলছেন না তিনি।

- এই আইসক্রিমটার দাম কত ?

- ৫০ টাকা

ছেলেটা তার জমানো কয়েনগুলো গুনতে শুরু করলো। ওয়েট্রেস রীতিমতো রাগান্বিত হয়ে গেল। কারণ তার সময় নষ্ট হচ্ছে। এদিকে কয়েন-গোনা শেষ করে ছেলেটা আরেকটা আইসক্রিমের দাম জিজ্ঞেস করলো।

– ছোট আইসক্রিম-এর দাম কত?

– এই তুমি শুধু শুধু যন্ত্রণা দিচ্ছো। যাও, টাকা হলে আইসক্রিম কিনতে এসো।

- বলুন না ছোটটার দাম কত?

- ৩৫ টাকা।

আচ্ছা এটার একটা দেন।

ছেলেটা পুটলি থেকে কয়েনগুলি বের করে হিসাব করে ৩৫ টাকা দিয়ে খেতে বসলো।

চুপচাপ আইসক্রিম খেয়ে ছেলেটা চলে যায়। দোকান বন্ধের আগে ওয়েট্রেস যখন টেবিল পরিষ্কার করতে আসলেন, তিনি দেখেন ১৫ টাকা সেখানে রাখা। ছেলেটা তার জন্য টিপ্স হিসেবেই ১৫ টাকা রেখে গিয়েছে। কিন্তু এই ১৫ টাকা যদি সে তখন দিতো তাহলে বড় আইসক্রিমটাই খেতে পারতো।

রীতিমতো ধাক্কা খেলো ওয়েট্রেস। ৫০ টাকা থাকা সত্ত্বেও গরিব ছেলেটা শুধুমাত্র তাকে টিপস দেয়ার জন্য কম টাকার আইসক্রিম কিনেছে।

তাই কাউকে বাহ্যিক পোশাক ও অর্থ দেখে বিচার করা উচিত না। অনেকে খুব চাকচিক্য পছন্দ করে, টাকা উপার্জন করে, কিন্তু মনের দিক থেকে ছোট থেকে যায়। তাই দামি গাড়ি, বাড়ি, পোশাক অথবা অর্থের জন্য হা-হুতাশ আর আফসোস না-করে মন মানসিকতা সুন্দর করতে হবে।

মনের সৌন্দর্যই-যে আসল সৌন্দর্য।

(ইন্টারনেটের বিদেশি গল্প অবলম্বনে)

সমর্পণ

সারা জয়ীমা শওকত
এমবিবিএস, ৫৯ তম ব্যাচ

শো--ক সং--বা--দ, শোক স--ং--বা--দ শহরের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী চৈতী দে আজ সকাল ১১টায় স্টেশন রোডস্থ তার স্বীয় বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। শুভানুধ্যায়ীদের দর্শনার্থে বিকেল ৩টায় তার মরদেহ স্থানীয় টাউন হল মিলনায়তনে রাখা হবে এবং সন্ধ্যা ৬টায় কেন্দ্রীয় শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

শোক সং--বা--দ, শো--ক সং--বা--দ

মাইকে চৈতীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। মুহূর্তেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সমগ্র পরিবার। চৈতীদির মৃত্যুর সংবাদ আমরা কেউই মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার অন্তহীন কান্না দেখে বাবা আমাকে চৈতীদির বাসায় নিয়ে চললেন।

চৈতীদির স্টেশন রোডস্থ বাসার দিকে যখন আমরা এগুচ্ছিলাম, তখন পথে-পথে শুনতে পেলাম লোকজনের মাঝে চৈতীদি-কে নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা। কর্মচঞ্চল শহরের ব্যস্ততা আজ যেন থমকে গেছে। স্টেশন রোডে যখন পৌছলাম, তখন দেখলাম : সমগ্র এলাকাটি লোকে লোকারণ্য। পুলিশ শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। জেলা প্রশাসকসহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা এসেছেন। এসেছেন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য-সহ অনেকেই।

অবশেষে চৈতীদির মরদেহের কাছে এসে দাঁড়ালাম। উঠোনের মাঝে পাটির উপর চৈতীদিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখটা রেখে সমগ্র শরীরটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। এ-কাপড়টিকে আবার আবৃত করে ফেলেছে লাল আর সাদা গোলাপ এবং হলুদ গাঁদা ফুলের স্তর। পুতুল প্রতিমা চৈতীদি যেন ছল করে চোখ দুটো বুজে আছে, মুখটা ফোলা, কোঁকড়ানো চুলগুলো মাথার উপরের দিকে ছড়ানো। হঠাৎ বৃদ্ধ ধীরেন বাবুর করুণ আর্তিতে সংবিৎ ফিরে পেলাম, "ভ--গ--বা--ন এ জন্যই কি তোমায় প্রতিদিন পুজো দেই, এই কি তার প্র--তি--দা--ন।" চারদিকে শুধুই কান্নার রোল। পাড়াপড়শিরা সান্ত্বনা দিতে এসে নিজেরাই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এমন হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের বর্ণনা করাও কঠিন। এরই মাঝে এগিয়ে চলতে থাকলো এক-এক করে সব ধর্মীয় আচার।

বিজয়ের উপস্থিতিতে হঠাৎ তরুণদের মাঝে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পুলিশ তা আঁচ করতে পেরে দ্রুত তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও চারদিকে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

বিকেল সাড়ে ৩টার কিছু পরেই চৈতীদির মরদেহ ভিড় ঠেলে ধীরে-ধীরে টাউন হল মিলনায়তনের দিকে এগুতে থাকে এবং ৪টা ১৫ মিনিটে পৌছায়। বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পীদের সমস্বরে করুণ সুরের মূর্ছনায় শোকার্ত পরিবেশটা আরো ভারী হয়ে উঠে। সকল মানুষের স্রোত তখন টাউন হলের অভিমুখে। জনস্রোত সামাল দিতে ট্রাফিক-পুলিশ ইতোমধ্যেই টাউন হল অভিমুখী সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়। টাউন হলের চারদিকে এত মানুষ। যেন টাউন হলটিকে আজ মনে হচ্ছে, সমুদ্রের মাঝে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

সন্ধ্যা ৭টায় পূর্ণ ধর্মীয় আচারের মধ্য দিয়ে শবযাত্রা শুরু হলো। চৈতীর মরদেহ নিয়ে শবযাত্রীর দলের সবার আগে একজন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, "বো--ল হ--রি"। শবযাত্রী-রা সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, "হরি বোল" এভাবেই এগিয়ে চললো শবযাত্রীরা, আর তাদের অনুসরণ করতে লাগলো সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ীরা।

সম্মিলিত শবযাত্রীর দল ধীরে-ধীরে এসে স্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীর 'সংগীত নিকেতনের" সামনের রাস্তায় এসে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। তখন সংগীত নিকেতনের ২য় ও ৩য় তলা থেকে চৈতীদির শবদেহের উপর পুস্পবৃষ্টির মতো ফুল ছোড়া হয় এবং একই সঙ্গে ভেসে আসে করুণ সুরের মূর্ছনা। ইতোমধ্যেই চৈতীদির মরদেহের পেছনেই গাড়ির চারদিকে একদল সতীর্থ শিল্পী করুণ সুরে গান গেয়ে চললেন, "আ-গু-নে-র পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ কর, পূর্ণ কর, দহন দানে, হে ভগবান" এবং এর সাথে সাথেই শবযাত্রা শ্মশান অভিমুখে এগিয়ে চললো। শিল্পীরাও শবযাত্রীদের সাথে এগিয়ে চললেন এবং করুণ সুরে গেয়ে চললেন। একপর্যায়ে শিল্পীদের গাওয়া সংগীত পরিণত হয় করুণ রোদনে।

শবযাত্রার সময় রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘরের আঙিনায় মুহূর্তে ছেয়ে যায় মানুষ, প্রিয় শিল্পীকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। কোনো কোনো ইমারত থেকে ছুড়ে মারা হয় ফুলের মালা। অগ্রবর্তী পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে জায়গা করে দিতে লাগলো শবযাত্রীদের এগিয়ে যাবার জন্য।

অবশেষে রাত ৮টায় চৈতীদির মরদেহ শ্মশানে এসে পৌছায় এবং শব চুল্লির উপর চৈতীদির মরদেহ রাখা হয়। পুরোহিতরা দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং এক-এক করে অন্তিম ধর্মীয় আচার

সম্পন্ন করেন। মুখাগ্নির সাথে সাথেই দাউ দাউ করে ঝলসে উঠে আগুনের লেলিহান শিখা। উন্মত্ত আগুন যেন মুহূর্তেই গ্রাস করলো চৈতীদিকে।

বাবাসহ আমি একটু দূরে সরে এসে দাঁড়ালাম আর ভাবছিলাম : এই সেই চৈতীদি যাকে আজ থেকে ক'বছর আগে প্রথম দেখেছিলাম স্থানীয় সংগীত নিকেতনে। এত সুন্দর পুতুল প্রতিমার মতো মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। গোলগাল মুখ, কোঁকড়ানো চুল, নজরকাড়া নাক, চোখ। ঠোঁটের উপর ডান পাশের গালে একটা ছোট তিল, ধবধবে সাদা চৈতী। বিধাতা যেন তিল তিল করে এই পুতুল প্রতিমা গড়েছিলেন তাঁরই বর্ণিল আবেগে। দিয়েছেন তাকে আরো বহুগুণ। আর চৈতীদি যখন গান গাইতেন, বিধাতা যেন নিজেই তার কণ্ঠে এসে সুর ধরতেন। এই সুকণ্ঠী পুতুল-প্রতিমাই ছিলেন আমার গানের শিক্ষিকা। বড্ড আপন ছিলেন তিনি, আমাদের পরিবারেও ছিলো তার অবাধ যাতায়াত। এই দেবদূত যখনই আমাদের বাসায় আসতেন, সবাইকে তিনি হাসি, আনন্দ আর সুরে মাতিয়ে রাখতেন। চৈতীদির ভুবন-ভুলানো হাসিতে আমরা মুগ্ধ হতাম বারবার।

চৈতীদি স্থানীয় একটি কলেজে ১ম বর্ষ স্নাতক শ্রেণিতে পড়তেন। একটি বাম ছাত্রসংগঠন এবং একটি সংগীতগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। শহরের প্রায় সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। তাকে ছাড়া যেন কোনো অনুষ্ঠানই প্রাণ পেতো না। চৈতীদি যখন গান গাইতেন তখন তার শরীর মৃদু দোলায় দুলতে শুরু করতো। দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার সময়ে হাত উঁচিয়ে, মুষ্টি তুলে, ঘাড় বাঁকিয়ে যখন গাইতেন, শ্রোতারা তখন অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতেন বারবার। ওয়ান মোর, ওয়ান মোর শব্দে তাকে অনির্ধারিত গানও গাইতে হতো।

এক শ্রেণির তরুণরা চৈতীদিকে ঘিরেই সব সময় ব্যস্ত থাকতো। একপর্যায়ে বিজয় নামক সুদর্শন তরুণকে জড়িয়ে চৈতীদিকে নিয়ে সবাই কেমন যেন কানাঘুষা করতেন। ওদের দু'জনকে প্রায়ই দেখা যেত একসাথে বিভিন্ন জায়গায়। চৈতীদি আর বিজয়ের সাজগোজ দেখে মনে হতো, যেন তারা সিনেমার তারকা, পৃথিবীর সবচেয়ে সার্থক মানব-মানবী। পরবর্তীতে জানলাম, চৈতীদি সত্যিই শাখা আর সিঁদুরের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়ের মা-বাবার সিদ্ধান্তে বিজয়ের অন্যত্র বিয়ে হওয়ায় চৈতীদি স্বপ্নভাঙার বিপর্যয়ের মাঝে পড়েন। চৈতীদি ছিলেন গরিব পরিবারের মেয়ে। এটি বিজয়ের পরিবার মেনে নিতে পারেনি। তা ছাড়া জাতপাতের বিষয়টিও একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আর কোনো বিবেচনাই স্থান পায়নি।

এই বিপর্যয়ে চৈতীদি ক্রমেই বেসামাল ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে হয়ে পড়েন শয্যাশায়ী। চিকিৎসার একপর্যায়ে ধরা পড়ে তার দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসার (লিউকেমিয়া)। অপর্যাপ্ত চিকিৎসায় চৈতীদি ক্রমেই মৃত্যুমুখে এগুতে লাগলেন।

এই অসহায় মুহূর্তে তার পাশে তেমন কেউই ছিলো না। তবে বিভিন্ন সংগীতগোষ্ঠীর শিল্পীরা সব সময়ই চৈতীদির সাথে একটা নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তাদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে।

আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে কিছুদিন পূর্বে চৈতীদিকে দেখতে গিয়েছিলাম। মলিন হাসিতে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ তোমরা? আমার কাছে এসে বসো।" হতবাক হয়ে জানতে চাইলাম, "আপনি এখন কেমন আছেন?" হতাশ হয়ে বললেন, "এই তো আছি। তোমরা গান শুনবে?" আমরা গান গাইতে অনুরোধ করায় তিনি বহু কষ্টে উঠে বসে খালি গলায় গাইতে লাগলেন,

"হেরে গেছি আজ আমি নিজেরই কাছে,
হেরে গেছি জীবনের খেলাতে,
এই মনে ছিলো যত গর্ব আমার,
কে যেন সব ভেঙে দিয়েছে ----।"

চৈতীদির গলা তখন ক্রমেই জড়িয়ে এসেছিলো আর দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রু। আমাদের চোখও তখন বেদনায় অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। এ দেখাই ছিলো এই পুতুল প্রতিমাকে দেখা, আমার শেষ দেখা এবং এ গানটিই ছিলো চৈতীদির জীবনে শেষ গান। হঠাৎ অর্চনা দেবী এসে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "চৈতী, একটু ঘুমাও তো মা"।

আমরা তার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পেরে দ্রুত চলে এলাম।

হঠাৎ ধ্যান ভাঙলো চিতায় প্রজ্বলিত আগুনের উন্মত্ত লেলিহান শিখা দেখে। দাউ দাউ করে জ্বলছে অগ্নিশিখা, ক্রমেই গ্রাস করতে লাগলো সবকিছু। চৈতীদি যেমনি অসহায়ভাবে তার বর্ণিল স্বপ্ন সমর্পণ করে গেলেন এই বহমান সভ্যতার কাছে, আমরাও অনুরূপ অসহায়ভাবে চৈতীদিকে সমর্পণ করে গেলাম এ-চিতায়।

এক-এক করে আর সবার সাথে আমরাও সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলাম। যখন ফিরছি তখন কেবলই স্মৃতিতে ভেসে আসতে লাগলো, চৈতীদির গাওয়া সেই করুণ গানটা-

"হেরে গেছি আজ আমি
নিজেরই কাছে,
হেরে গেছি জীবনের খেলাতে।"

কবিতা ও গান

প্রফেসর ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

এক.

মেঘের জলে ডুবা চাঁদ এক

'আমি তোমায় ভালোবাসি' কইলে কতজনে,
কও সত্যমনে,
হৃদয়পাড়ায় মুকুলিত ফোটেনি সাহস আর
'স্মৃতিসুন্দর' বাজে হঠাৎ ভায়োলিনের তার
এরূপ কতবার ?
অথবা তুমি-ই যেচেছিলে ওতো মূর্তি-কাঠ
বাতাসা প্রসাদ মানত মেনেও ঘামেনি তার হার্ট,
রতন চিনতে হয়েছে ভুল ? বুকের লাল গোলাপ
কালো রঙে লেপ্টে দিলে শূল ও মনস্তাপ,
এসব ঘটে– যে কোনোটা, জীবনপালায় কে দোষ ধরে!
বর্ণচোরা প্রণয়পাশা রাশির চাল বড্ড নড়ে
তুলবে ঘরে ?
'মেঘের জলে ডুবা চাঁদ' এক, রয় তাকিয়ে "শ্রাবণতারা'
প্রেম মহড়া-ব্যাকুলপারা।

দুই.

জীবনটাকে নিয়ে মানুষ

জীবনটাকে নিয়ে মানুষ (বড়) মুসিবতে আছে
কী করবে তার না পায় ভেবে ভর ধরেছে গাছে।

বোকা মানুষ হাঁদা মানুষ ধর্মরোগে বাঁধা মানুষ
হৈহৈ হৈহৈ মারামারি রৈরৈ রৈরৈ কাটাকাটি
কপচায় শুধু টিয়া বুলি মতলব চালে কেবল নাচে।

(জন্ম থেকে) উপদেশের বস্তামাথায় মেরুদণ্ড তায় বেঁকে যায়
পুরুষের এক ইতিহাস যুদ্ধ ফ্যাসাদ চায় বারোমাস
প্রেমের জাতির মায়ের জাতির অশ্রু যাচে।

মহামানব এসেছিলো তাঁদের কথা না শুনিলো
জ্বীন-ভূতের ভয় দেখাইয়া ভূমি নারী দখল নিয়া
পৃথিবীকে দেয় না কিছু, পরকালে সব তো আছে।

৫৫তম প্রজন্ম! তোমাকেই বলছি

ইসরাত সুলতানা
৫৫তম এমবিবিএস

প্রাণের ৫৫তম প্রজন্ম–
এক শীতের সকালে শুরু হয়েছিলো তোমার যাত্রা
তোমার অভিষেক CMC-র ইতিহাসে যোগ করেছিলো অন্য এক মাত্রা
অ্যাপ্রন পরা নতুন কিছু মুখ ইতিউতি করছিলো
কেউ হয়তোবা নতুন বন্ধু পেয়ে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো
কারো চোখে ছিলো ভারী ফ্রেমের চশমা
কেউ যেন পেছন থেকে ডাক দিলো–
'এই মেয়ে তুমি না কাউছার চাচার মেয়ে রমা??
করিডোরে বেশ কিছু ছেলে জটলা পাকিয়ে
সুন্দরী কোনো মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে
বলছিলো গোপালভাঁড়ের কাহিনি
আর আমি ??? সদ্য নতুন কেনা ব্যাগটা হাতে
দিয়েছিলাম তাদের দিকে এক ভারিক্কি চাউনি ॥
অদ্ভুত লাগছিলো আশপাশটা
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিলাম দেখে Anatomy Dissection Hall-এর চারপাশটা
ভাবছিলাম মনে মনে-
হায় খোদা! এ কোন্ জায়গায় এলুম
মনে হয়, ছেলেবেলার সেই কানা ভূতটার ভয় আবার পেলুম ॥
ক্লাস- হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রথম ক্লাস ছিলো Biochemistry
আর সেটা যখন হচ্ছিলো শুরু
হ্যাবলা আমার কাঁপছিলো বুকটা দুরুদুরু ॥
Lecture Hall-এ বসে সবাই শুনছিলো স্যারের কথা
কেউ-বা দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলো না-বুঝে সেই কথার আগা-মাথা ॥
সেই থেকেই শুরু–
ছিলাম, আছি, থাকবো ইন্‌শাআল্লাহ্ থাকবো একসাথে
ক্যান্টিনে বসে একই সাথে, ভাত নেই আমরা পাতে ॥
Pending, Prof, supplementary-তো কী হয়েছে?
এসবে ভয় পেতে পেতে আমাদের সহ্য হয়ে গেছে ॥
সুখে-দুঃখে জড়িয়ে আছে আমাদের এই প্রিয় ক্যাম্পাস
হয়তোবা কোনো একসময় এই সবই মনে পড়বে
ফেলবো তখন দীর্ঘশ্বাস ॥

অকালবোধনে প্রেম

প্রিতম মল্লিক টুটুল
৫৬তম এমবিবিএস

তারপর আর কোনো দিন চাঁদ দেখিনি আমি
যেখানে যাই শুধু রাত হয়ে যায়।
সর্বশেষ দেখেছিলাম
তোমার কোজাগরী রূপ ...
ভেবে দেখো তো–
ভালোবাসা বুকে নিয়ে বসে থাকা
কোনো এক যুবকের কথা !
যে কিনা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে
গত বসন্তের আগে থেকে।

তোমার একটি স্পর্শে যে বিস্ফোরিত হবে
ভেঙে হবে ধুলো ...
জন্মকে-মৃত্যুকে ধরে বাজি
যে কিনা হেরে যেতেও রাজি!
তাকে কী দেবে তুমি?
শুধুমাত্র এক চিলতে সিঁদুরের দাবিই কি সব?
তুমি কি আজও বোঝনি,
ভালোবাসা-যে সবচেয়ে দামি।
প্রাণহীন কতগুলো অক্ষর সমাহার নয়,
নয় কোনো নিছক বিমূর্ত আদর্শ।
ও জন্মে বেপরোয়া মন আবার প্রেমে পড়বে
তোমার ভালোবাসার আগুনে পুড়িয়ে জন্ম করবো সার্থক
মনের যা কিছু ক্ষুদ্র, গ্লানিময় তার আত্মাহুতি হবে
আমি? হ্যাঁ... বড্ড বোকা আমি, তাই না ???

ইচ্ছেঘুড়ি

হাসান মুহাম্মদ শহীদুজ্জামান
২৭তম বিডিএস

ইচ্ছেঘুড়ির ডানাটা মেলতে আজ অনেক ভয়,
হারিয়েছি সব সাহস উল্টোরথের নেশায়।
জীবনের ধারাটা যেন করে চলেছে বিদ্রুপ,
নির্মম সত্য যেন আজ শোষকের চাবুক,
কখন যেন চলতে শুরু আমার এই অন্ধকারে,
কখন যেন পরিণত হয়েছি ভীরুতার দাসে,
আঁধারের শিকলটা আজ ঝুলে থাকে গলায়,
নিজের অক্ষমতা আজ নিজেকে কাঁদায়।

আঁধারে বিবর্ণ ঘুড়িটা আর সহ্য হয় না,
কেন জুটবে ভাগ্যে দুর্দশার অমানিশা ?
আমি আনবো রং ঐ ইচ্ছেঘুড়ির ডানায়,
আঁকড়ে ধরবো সময় রথের লাগামটায়,
ভয় হতে পারবে না দাসত্বের বেড়ি,
আমি ওড়াবোই আমার 'ইচ্ছেঘুড়ি'।

Truth is beauty
To
My Beloved Sandhani

Israt Sultana
55th MBBS

Salute you from my core of heart
When humanity cries facing threat,
in just, cold war
I can't but hold my tears
Civilization what's the value of you ???
You oppress the humanity, shacking, tramping it.
I can't but hold my tears.

অষ্টাদশী

সামি মোহাম্মদ নিজাম
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
২৭তম বিডিএস

কাঁদছো তুমি ?
দুঃখ অনেক ?
বুক ফেটে যায় আর্তনাদে ?
কেউ কি তবে একলা ফেলে গেছে চলে ?
ঐখানে এক পাহাড় আছে শক্ত, নিথর
দেখতে যাবে ?
ঐ পাহাড়ের বুকের ভেতর জমাট ভীষণ চিৎকার আছে
কেউ শোনেনি।

মেঘকুমারী আসবে বলে সেই
যে গেলো, আর ফেরেনি।
কাঁদছো তুমি, কান্না ঝরুক
পাহাড়টাকেও বলে দিয়ো কাঁদতে শিখুক
জল ছুঁয়ে যাক কষ্টগুলোয়
এই শহরের ময়লা ধুলোয়।
সুখস্মৃতি সব ডুকরে কাঁদুক;
নষ্ট প্রেমের কষ্টেরা সব ঘৃণায় বাঁচুক।

মৃত শহর

নাহিদ হাসান
৫৭ তম এমবিবিএস

ঠিক মর্গে যখন শহরের লাশটা
কাটাছেঁড়া করা হলো!
শহরের বুকে সোনালি নদী দেখে
ডোম বললো,
'আহ! এই খুন কী অপূর্ব শিল্প!! '
ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে মুগ্ধ চিকিৎসক তাকিয়ে থাকে,
পেশাদারিত্ব আর শিল্পের কী অপূর্ব মেলবন্ধন!
শান্ত খুনির জ্ঞান আর পরিকল্পনার
নিখুঁত মিলন।

শহরের গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ছিলনা,
কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন ছিলনা।
শুধু ছিল পাবলিক লাইব্রেরিতে
দিন রাত এক করা
এক নিখুঁত শিল্পীর চুমুর দাগ...

প্রশ্ন

ইসরাত সুলতানা
৫৫তম এমবিবিএস

আমি বিজয় দেখিনি–
কিন্তু অনুভব করি তার রূপ, তার সৌন্দর্য
আমি যুদ্ধ দেখিনি
কিন্তু বুঝতে পারি তার নৃশংসতা
'৭১ আমি দেখিনি কিন্তু
আমি জানি কী হয়েছিলো তখন
কারণ ২৫শে মার্চের সাক্ষী আমার ঘরে
১৪ই ডিসেম্বর স্বজন-হারা মানুষদের আমি চিনি
কারণ বীরাঙ্গনা সাফিনা খালার সাথে আমার প্রায়ই দেখা হয়
তাহলে কেন আমি জানবো না?- কেন আমি শুনবো না
তাদের বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা শোকের কাহিনি ?
কারণ একাত্তর হৃদয় জুড়ে আছে।
একসময় দেখতাম একাত্তরের নরপশুদের দৌরাত্ম্য
আমি শিহরিত হতাম, আতঙ্কে কাটতো আমার প্রতিটা দিন
আর এখন দেখি দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে চলা মানুষের রাজত্ব
আমি বাগ্‌রুদ্ধ হয়ে যাই
লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে– যখন দেখি
এইসব দেশদ্রোহীদের পক্ষে কথা বলছে আমারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু
আমি নিশ্চুপ থাকি, কারণ তর্ক করে
লাখো মানুষের রক্তের প্রতিটা ফোঁটাকে আমি খাটো করতে চাই না
শুধু অবাক হয়ে দেখতে থাকি
ভূলুণ্ঠিত, পদদলিত মানব-বিবেককে ॥

২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারে সন্ধানীয়ানরা

একুশে ফেব্রুয়ারির আলপনা

জন্মদিনে সন্ধানীয়ানদের মিলনমেলা

জন্মদিনের কেক কাটা

হাড়-কাঁপানো শীতে উষ্ণতার সন্ধানে

বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত হেলথ ক্যাম্প

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচি

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্যয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি একাডেমি সংঘের সাথে রক্তদান কর্মসূচি

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সন্ধানীয়ানদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি

রিজেন্সী গার্মেন্টিসে সফল রক্তদান কর্মসূচি শেষে সন্ধানীয়ানরা

থ্যালাসেমিয়া প্রজেক্ট উদ্বোধন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচি

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্যয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি একাডেমি সংঘের সাথে রক্তদান কর্মসূচি

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সন্ধানীয়ানদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি

রিজেন্সী গার্মেন্টিসে সফল রক্তদান কর্মসূচি শেষে সন্ধানীয়ানরা

থ্যালাসেমিয়া প্রজেক্ট উদ্বোধন

ডা. বাসনা মুহুরী ম্যাডামের সৌজন্যে সন্ধানীর নতুন ফ্রিজ উদ্বোধন

ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম শেষে সন্ধানীয়ানরা

আয়কর মেলায় সফল রক্তদান কর্মসূচি

চলছে প্রচার সপ্তাহ পালন-এর প্রস্তুতি

আইনজীবী বিজয়া সম্মেলন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি শেষে

আইনজীবী বিজয়া সম্মেলন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচির আলোচনাসভা

চিত্রে সন্ধানীর কার্যক্রম

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে সন্ধানীয়ানরা

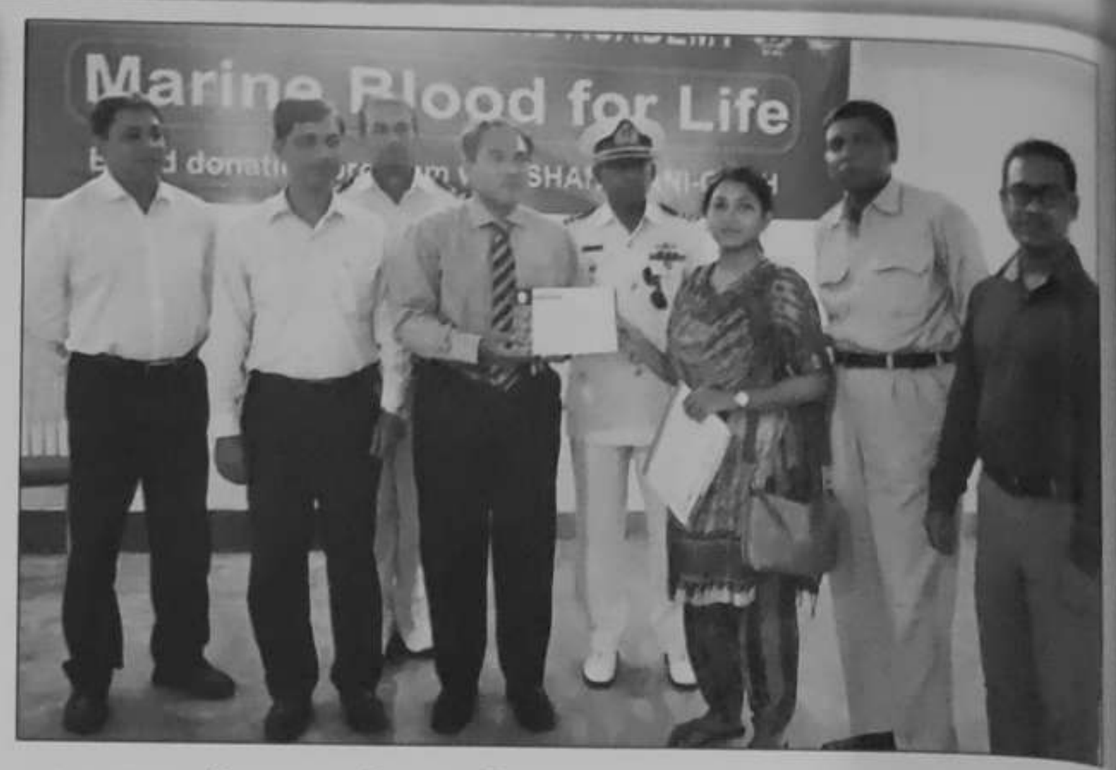

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি শেষে সনদপত্র হস্তান্তর

হুয়েট ডে উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

শ্রীশ্রী নারায়ণ মন্দির উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

রক্ত সংগ্রহে ব্যস্ত রক্তদান কর্মসূচিতে ব্যস্ত সন্ধানীয়ানরা

ডা. সাফিয়া গাজী ম্যাডামের পক্ষ থেকে সন্ধানীর জন্য উপহার সামগ্রী

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষ্যে চিটাগাং পুলিশ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষার্থীদের সাথে মোটিভেশন প্রোগ্রাম

সেবা সংগঠনের আয়োজনে ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম

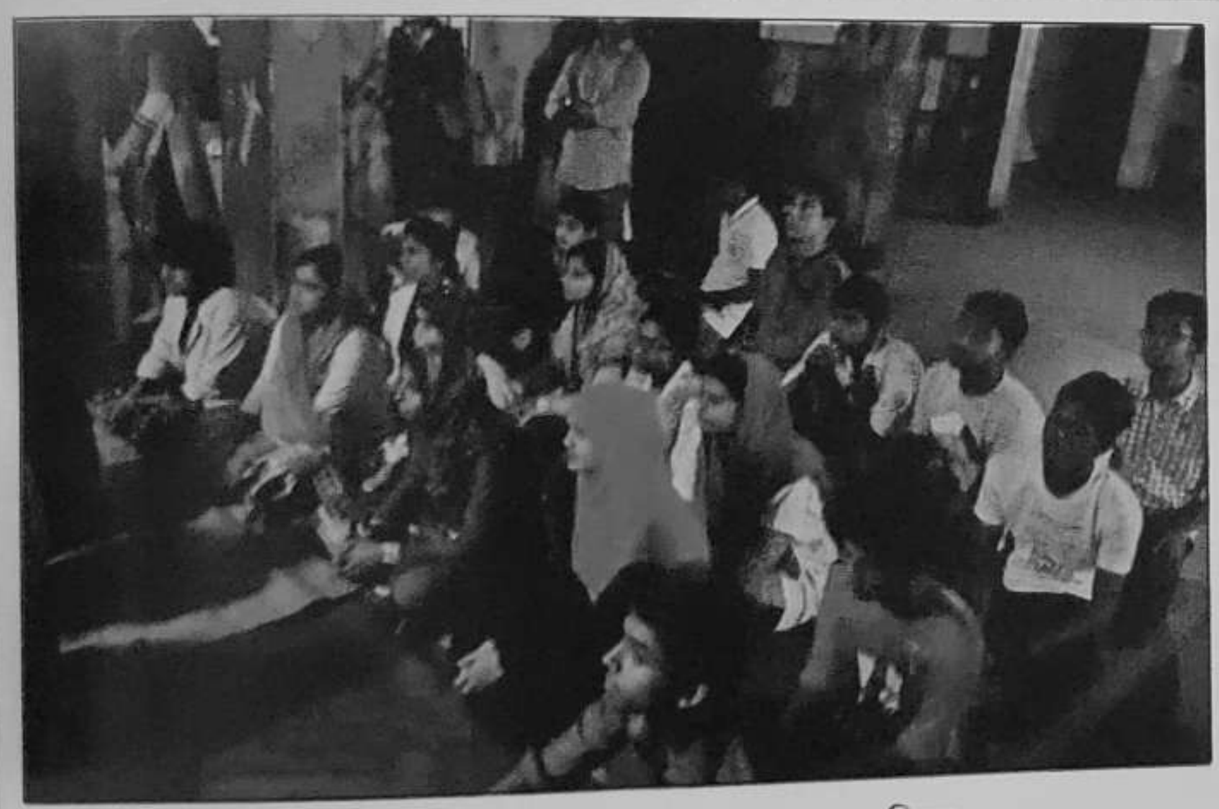

অপরাজেয় বাংলার পথশিশুদের সাথে ইফতার মাহফিলে

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচিতে

চট্টগ্রাম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এর সাথে ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম

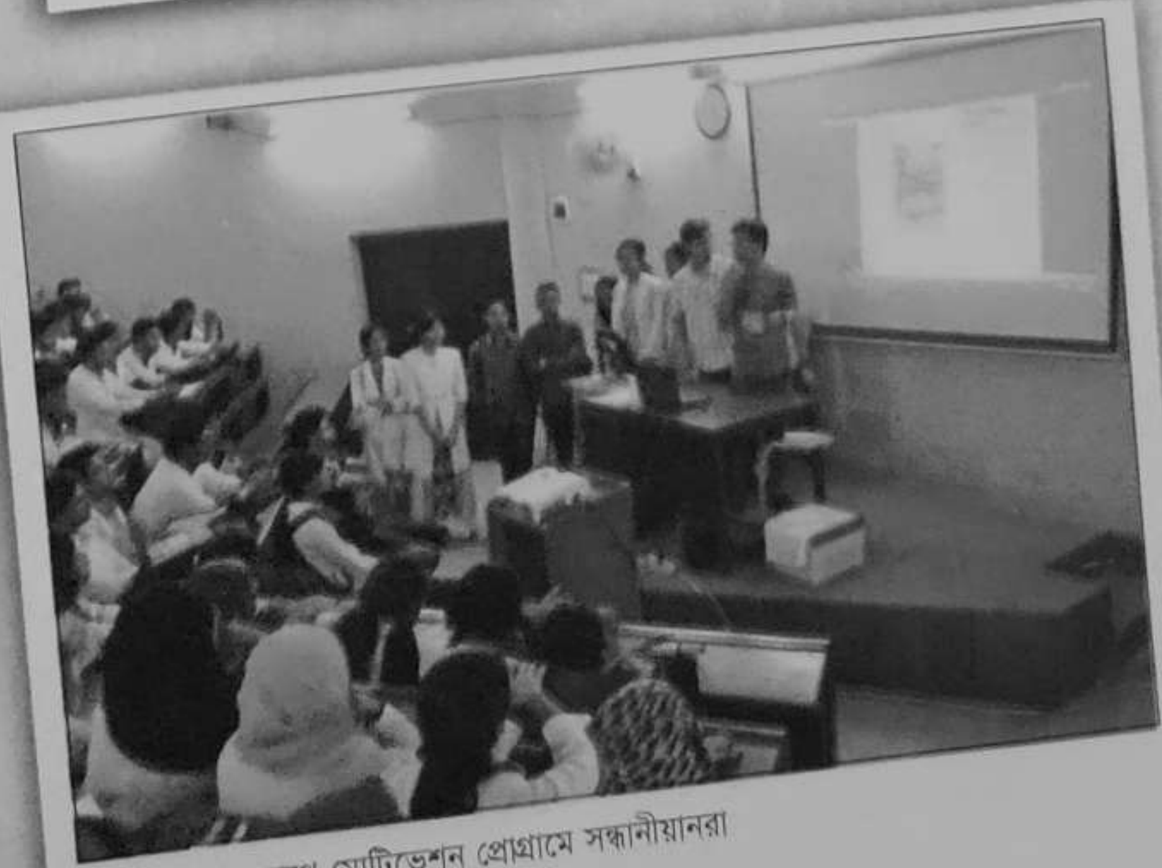

নবীনদের সাথে মোটিভেশন প্রোগ্রামে সন্ধানীয়ানরা

চিত্রে সন্ধানীর কার্যক্রম

স্বপ্ননগর বিদ্যানিকেতনে আয়োজিত স্কুল মোটিভেশন প্রোগ্রাম

সাজেকের পথে

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক রক্তদাতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের র‍্যালী

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক রক্তদাতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিদের সাথে সন্ধানীয়ানরা

জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এম.পি-এর সৌজন্যে নতুন এসি হস্তান্তর

ইরফান ভাইয়ের বিয়েতে

কৃতজ্ঞ যাঁদের কাছে

আলহাজ্ব আ. জ. ম. নাছির উদ্দিন
ডা. মুজিবুল হক খান
অধ্যাপক ডা. সেলিম মো. জাহাঙ্গীর
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জালালউদ্দীন
অধ্যাপক ডা. আমিনউদ্দীন এ খান
ডা. মাহবুবুল আলম
অধ্যাপক প্রফেসর এম.এ. সালেক
অধ্যাপক ডা. মো. তোসাদ্দেক হোসেন সিদ্দিকী (জামাল)
ডা. মো. মনোয়ার-উল-হক (শামীম)
ডা. নাজমুল হোসেন
ডা. মশিহুজ্জামান আলফা
ডা. এস. এম. মঈনউদ্দীন
অধ্যাপক ডা. সুযত পাল
অধ্যাপক ডা. মুলকুতুর রহমান
অধ্যাপক ডা. বাসনা মুহুরী
অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউনুস
ডা. নূর হোসেন ভূঁইয়া শাহীন
অধ্যাপক ডা. প্রদীপ কুমার দত্ত
অধ্যাপক ডা. গোফরানুল হক
অধ্যাপক ডা. তাহমিনা বানু
অধ্যাপক ডা. আনোয়ার হোসেন
ডা. মমতাজ বেগম
ডা. রায়হান বানু
ডা. বিজন কুমার নাথ
ডা. ওমর ফারুক
ডা. লেনিন আমিনুল হক
ডা. সমিরূল ইসলাম বাবু
ডা. সন্দ্বীপন দাশ
প্রফেসর ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী
ডা. খোরশেদ আলম

ডা. সুমন
ডা. মনসুর আলম
ডা. অরূপ কুমার দত্ত বাপ্পী
ডা. সাফিয়া গাজী রহমান
A. K. Khan Foundation
Sunshine Charities
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম
ইস্পাহানী লিমিটেড
Dhaka Bank
Opsonin Pharma Ltd.
Incepta Pharmaceuticals Ltd.
Chevron
CSCR
Beximco Pharmaceuticals
Chittagong Metropolitan Hospital
National Hospital
Life Care Centre
Biopharma
Super Refinery
Max Diagnostic
Western Marine
Albion Pharma
4H Group
Eastern Refinery Limited
গাজী ওয়্যারস লিমিটেড
Uni Group of Company
Green Life Medical College Hospital
Health Care Pharmaceuticals Ltd.
Medical Centre
Green Delta Insurance

Berger
Ziska Pharmaceuticals Ltd.
GSK
S P Traders
ACME
CSTC
The Ad Communication
IFIC Bank
Southeast Bank
Trust Bank
Metro Diagnostic
Poly Hospital
Care Lab
Popular Diagnostic
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব
দৈনিক সমকাল
দৈনিক পূর্বকোণ
দৈনিক আজাদী
দৈনিক প্রথম আলো
Radio Foorti
আজকের প্রজন্ম
আলোর মিছিল
আবুল খায়ের গ্রুপ
স্কয়ার গ্রুপ
অপরাজেয় বাংলা
যমুনা অয়েল
পদ্মা অয়েল
Navana Pharmaceuticals